# أَوْضَحُ البَيَان
# مِنْ
# أيَاتِ الْفُرْقَان

# আওদ্বাহুল বয়ান মিন আয়াতিল ফোরকান

(আল্-কোরআনের কিছু আয়াতের স্পষ্ট ব্যাখ্যা)

[ ১ম খন্ড ]

রচনায়
মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী

প্রকাশনায়
আন্জুমানে কাদেরীয়া চিশ্তীয়া আজিজিয়া বাংলাদেশ

.....

সার্বিক তত্ত্বাবধান:

শাহজাদা অধ্যক্ষ আল্লামা আবুল ফরাহ্ মুহাম্মদ ফরিদউদ্দীন

অনুবাদ: এম. এম মহিউদ্দীন
মুদার্রিস- ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মূঈনীয়া কামিল মাদ্‌রাসা।
নির্বাহী সম্পাদক- মাসিক আল্-মুবীন।

সহযোগিতা:
শাহজাদা আলহাজ্ব আল্লামা আবুল ফছিহ মোহাম্মদ আলাউদ্দীন।

আর্থিক সহযোগিতাঃ
আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইলিয়াছ কোম্পানী
পিতা: আলহাজ্ব মোহাম্মদ সোনা মিয়া
গ্রাম: উত্তরসর্ত্তা, রাউজান।
বিদেশ ঠিকানা: আল-মারিডেরা ফ্যাশন, নায়েব রোড, ডেরা দুবাই।

প্রকাশনায়: আন্‌জুমানে কাদেরীয়া চিশতীয়া আজিজিয়া বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশ: জুন, ২০১৩ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ: আগস্ট ২০১৪ ইং
(সর্বসত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত)

মূল্য: ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

.....

# সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| ভূমিকা | ১০ |
| অনুবাদকের কথা | ০৯ |
| **﴿ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾** | ১১ |
| আয়াতের অনুবাদ ও তাফসির | ১১ |
| **هُدًى لِلْمُتَّقِينَ** এর অর্থ ও উদ্দেশ্য | ১১ |
| বিশ্বাস ও ইয়াকিনের স্তর | ১২ |
| **﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾** এর অর্থ ও উদ্দেশ্য | ১৩ |
| **الغيب** এর অর্থ ও উদ্দেশ্য | ১৪ |
| **وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ** এর বর্ণনা | ১৫ |
| **﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾** | ১৬ |
| আয়াতের অনুবাদ ও তাফসির | ১৬ |
| বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি নিহত হওয়া ও গরুযবেহ করার ঘটনা | ১৬ |
| **﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾** | ১৮ |
| আয়াতের অনুবাদ ও তাফসির | ১৮ |
| **الصَّلَاةِ الْوُسْطَى** এর উদ্দেশ্য | ১৯ |
| আয়াতের তাৎপর্য | ২০ |
| **﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾** | ২১ |
| আয়াতের অনুবাদ ও তাফসির | ২১ |
| নূর ও কিতাবের উদ্দেশ্য | ২১ |
| মোল্লা আলী ক্বারী ও মাহমুদ আলূসী হানাফীর নিকট নূর ও কিতাব | ২২ |

| | |
|---|---|
| দ্বারা নবী করীম ﷺ: এর পবিত্র সত্তার আলোচনা এ আয়াতের শুরুতে স্বতন্ত্রভাবে এসেছে | |
| **قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ** এ আয়াতের তারকীব | ২৩ |
| **﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾** | ৩০ |
| আয়াতের অনুবাদ ও তাফসির | ৩০ |
| বাহাত্তর দলের বর্ণনা | ৩০ |
| আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত জান্নাতী দল | ৩১ |
| মুক্তিপ্রাপ্ত দলের মাপকাঠি **ما أنا عليه و أصحابى** | ৩২ |
| 'সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, মুজতাহিদ ইমামগণ ও আউলিয়ায়ে কেরাম' আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ছিলেন | ৩৩ |
| **﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾** | ৩৪ |
| আয়াতের অনুবাদ ও তাফসির | ৩৪ |
| ঈমানের অর্থ ও উদ্দেশ্য | ৩৫ |
| ঈমান আনার উদ্দেশ্য<br>ঈমানের প্রকারভেদ | ৩৫<br>৩৬ |
| ঈমানের মূল ছয়টি | ৩৯ |
| ঈমানে শরয়ীর ব্যাপারে আলিমদের মতামত | ৩৯ |
| মূল ঈমান স্থায়ীভাবে জাহান্নামী হওয়া থেকে হেফাযত করে এবং পরিপূর্ণ ঈমান জাহান্নামে প্রবেশ থেকে হেফাযত করে | ৩৯ |
| অবস্থাভেদে ঈমান ছয় প্রকার | ৪০ |
| আশা'য়েরা ও মাতুরিদিয়ার মতে আমল ঈমানের অংশও নয়, শর্তও নয় | ৪১ |

| | |
|---|---|
| জমহুরে মু'তাজেলা ও খাওয়ারেজের মাযহাব আমল ঈমানের অংশ ও রুকন | ৪২ |
| ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ | ৪৩ |
| আয়াতের অনুবাদ ও তাফসির | ৪৩ |
| **أهل عباء** আহলে 'আবার বর্ণনা | ৪৪ |
| গোলামের উপরও আহলে বাইতের ব্যবহার | ৪৪ |
| আহলে বাইতের ফযীলত | ৪৪ |
| আউলিয়ায়ে কেরামের ঈমানদার ছেলের মর্যাদা | ৪৫ |
| জান্নাতী মানুষেরা নিজের ছেলে সন্তানের সাথে জান্নাতে থাকবে | ৪৫ |
| আউলিয়ায়ে কেরামের সন্তানদের সম্মান | ৪৬ |
| ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ | ৪৮ |
| আয়াতের অনুবাদ ও তাফসির | ৪৮ |
| ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ এ আয়াতে ছয়টি ক্বেরাত রয়েছে | ৫১ |
| ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ | ৫৫ |
| আয়াতের অনুবাদ ও তাফসির | ৫৫ |
| **أَرْسَلْنَاكَ** ও **رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ** এর তাহ্কীক ও তার্কীব | ৫৬ |
| রাসূলে করীম ﷺ রহমত বণ্টনকারী, সারা জগত তাঁর রহমত গ্রহণ কওে, সারা জাহান তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তিনি তাঁর প্রভুর মুখাপেক্ষী | ৫৭ |
| সারাজগত এখন অবশিষ্ট তাই নবী করীম ﷺ ও জীবন নিয়ে বিদ্যমান | ৫৭ |
| **رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ** গুণটি রাসূলে করীম ﷺ এর বিশেষ গুণ ও রেসালাতের মর্যাদা | ৫৭ |
| ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ | ৫৯ |

| | |
|---|---|
| আয়াতের অনুবাদ ও তাফসির | ৫৯ |
| রাসূলে করীম (দ.) কে তাঁর নাম ও উপনাম দিয়ে ডাকা নিষেধ | ৬০ |
| ইয়া রাসূলাল্লাহ না বললে ধাক্কা দেওয়া সাহাবাদের সুন্নাত | ৬১ |
| ﴿قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا﴾ | ৭৭ |
| আয়াতের অনুবাদ ও তাফসির<br>**وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَه** এর অর্থ ও মর্মার্থ | ৭৭<br>৭৭ |
| আত্মীয়-স্বজন কারা | ৭৭ |
| **حَسَنَةً** থেকে আহলে বাইতের মুহাব্বত করা | ৭৭ |
| ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ | ৭৮ |
| আয়াতের অনুবাদ ও তাফসির | ৭৮ |
| **إن** শব্দটি সম্ভাব্য বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাই বুঝা যায় সন্তান না হওয়া নিশ্চিত নয়: এ প্রশ্নের জবাব | ৭৯ |
| **العابدين** এর তাহকীক ও অর্থ | ৮০ |
| দুনিয়াতে পিতা-পুত্রের মাঝে সম্পদ ইত্যাদিতে কেন পার্থক্য দেখা দেয়? এর জবাব | ৮২ |
| **إن كان** শর্তের জন্য , শর্ত তবে নিশ্চত হয় না | ৮৩ |
| **إن** কে না বোধকের জন্য নিলে তার অর্থ ও মর্ম | ৮৪ |
| **ولد** এর তাহকীক | ৮৫ |
| ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾ | ৮৭ |
| আয়াতের অনুবাদ ও তাফসির | ৮৭ |
| আয়াতের শানে নুযুল | ৮৮ |

| | |
|---|---|
| আয়াতে কাফির থেকে জীবিত কাফির উদ্দেশ্য | ৮৯ |
| **يَئِسَ** শব্দের তাহকীক | ৯০ |
| কবরবাসী খোদাপ্রদত্ত্ব শক্তি বলে লোকের চাহিদা পূরণ করে | ৯১ |
| কবরবাসী থেকে চাওয়া বৈধ এবং তার অসীলা নেওয়া ও জায়েয | ৯২ |
| **﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾** | ৯৪ |
| আয়াতের অনুবাদ ও তাফসির | ৯৪ |
| **عَبَسَ** এর তাহকীক | ৯৫ |
| এই সূরা রাসুলে করীম ﷺ এর সততা ও আমনতদারির দলিল | ৯৫ |
| হযরত ইবনে মাকতুমের ঘটনা | ৯৬ |
| আয়াতের শানে নুযুল | ৯৬ |
| **﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾** | ১০১ |
| আয়াতের অনুবাদ ও তাফসির | ১০১ |
| **ضَالًّا** এর অর্থ ও মর্ম এবং এর আভিধানিক অর্থ | ১০৫ |
| **ضَالًّا** এর তাহকিক | ১০৫ |
| আরবি ভাষায় **راعنا** এর কয়েকটি অর্থ | ১০৬ |
| **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى** এর তারকিব | ১০৭ |
| ক্বেরাত শায্যা দিয়ে দলিল দেওয়ার হুকুম | ১১০ |
| অঙ্গীকারের দিন নবী করীম ﷺ এর নূর থেকে সকল রূহকে সৃষ্টি করা | ১১২ |
| রাসূলের মকান (অবস্থান স্থল) সাতটি | ১১৫ |

.....

# পরিশিষ্ট


| | |
|---|---|
| পরিপূর্ণ ঈমানের অংশ | ১১৬ |
| তাওহিদ রেসালতের আক্বীদাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট অনেক গুরুত্ববহ | ১১৭ |
| নবী করীম ﷺ এর জ্ঞান ও মুশাহাদাকে মুশাব্বা বিহি ও ইব্রাহিম (আ) এর জ্ঞান ও মুশাহাদাকে মুশাব্বা দ্বারা ব্যাখ্যা | ১১৮ |
| হাড্ডি গোশত থেকে খোরাক অর্জন করে দু'টি দুই জাতের একটি সুক্ষ্ম আরেকটি মোটা | ১২২ |
| ইবনে তাইমিয়া ও মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদী অনেক ফিতনার জন্মদাতা | ১২৮ |

## অনুবাদকের কথা

### বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

### نَحْمَدُه وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمْ وَعَلى رَسُوْلِه الكَرِيم، أمابعد!

প্রখ্যাত অলেমেদ্বীন, বিশিষ্ট লিখক ও গবেষক শায়খে তরিকত, পেশোয়ারে আহলে সুন্নাত উস্তাজুল ওলামা হযরত আল্লামা আলহাজ্ব মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী মাদ্দাজিল্লাহুল আলীর লিখিত পবিত্র কোরআন শরীফের কয়েকটি আয়াতে করিমার বিশদ ব্যাখ্যা সম্বলিত "আওদ্বাহুল বয়ান মিন আয়াতিন ফোরকান" নামক কিতাবটি কোরআন শরীফের তাফসীর সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্ববহ। এখানে লেখক মহোদয় আয়াতের অনুবাদ, তাফসীর, আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের আলোচনা এবং প্রতিটি আয়াতে করীমা হতে শানে রেসালত ও প্রাসঙ্গিক মাসআলা বর্ণনা করেছেন, যা সাধারণতঃ সকলের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

অত্র পুস্তিকাটি হুজুর কেবলা উর্দু ভাষাতে রচনা করেছেন, আমি অধম হুজুর কেবলার নির্দেশক্রমে তাঁর দোয়াকে একমাত্র সম্বল করে সর্বসাধারণের পাঠের সুবিধার্থে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছি। মূল কিতাবের হুবহু অনুবাদের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও পাঠকগণের নিকট কোন প্রকার ভুলত্রুটি গোচরীভূত হলে, অত্র প্রকাশনা সংস্থাকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে হুজুর কেবলার দীর্ঘায়ু ও উচ্চ মর্যাদা কামনা করছি এবং যারা অত্র পুস্তিকাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্য মঙ্গলকামনা করছি। আমিন।

অনুবাদক
**এম. এম. মহিউদ্দীন**
মুদার্রিস- ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মূঈনীয়া কামিল মাদ্‌রাসা।
নির্বাহী সম্পাদক- মাসিক আল্-মুবীন।

.....

# ভূমিকা

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

**الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على سيّد الأوّلين و الآخرين محمدن المرسلين و على آله و أصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين، أمَّابعد!**

আমি অধম মুহাম্মদ আজিজুল হক আরজ করছি, আমার নিকট বিভিন্ন সময়ে আমার কিছু সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম ও প্রিয়-ছাত্ররা পবিত্র কোরআনের কিছু জটিল আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন, আমার কম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যথাযথ ও বিশুদ্ধভাবে কালামে ক্বাদীম সম্পর্কিত ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। পবিত্র কোরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য অহীর ধারক-বাহক মহান আল্লাহর প্রিয় হাবীব ﷺ সঠিকভাবে বুঝেছেন ও জানেন। আর আল্লাহর অনুগ্রহে জ্ঞানীরা জানেন। আমি তো অধম পবিত্র কালামের অর্থ বুঝতে কিবা যোগ্যতা রাখি? হ্যাঁ যে সকল হযরতকে মহান আল্লাহ তাওফীক দান করেছেন সে সকল ব্যক্তিদের উক্তি বর্ণনামূলক কিছু সঠিক জবাব পাঠকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। তা সত্ত্বেও কোথাও যদি ভুল পরিলক্ষিত হয় এবং হওয়া স্বাভাবিক। (কেননা মানুষ ভুল ও ত্রুটির উপাদান দিয়ে গঠিত); কাজেই পাঠকদের নিকট অনুরোধ আমি অধমকে অবহিত করবেন যাতে পরিশুদ্ধ করা যায় এবং আমি সে সকল পান্ডুলপিকে একত্রিত করে ছাপানোর চেষ্টা করছি, যাতে সাধারণ জনগণ উপকৃত হন। অত্র পুস্তিকার নাম রেখেছি **"আওদ্বাহুল বয়ান মিন আয়াতিল ফোরক্বান"**। মহান আল্লাহ এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন আমীন!

অধম মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী
ছিপাতলী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
মার্চ ২৫, ২০১৩ ইং

.....

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম!**

**﴿ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾**

**অনুবাদঃ** ঐ নকশাসমূহ যা লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তথা কিতাব; সেখানে বাহ্যিক, শাব্দিক ও অর্থগত মৌলিক কোন ধরণের সন্দেহের অবকাশ নেই বরং তা প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে একটি অকাট্য ও সুদৃঢ় কিতাব।[১]

**তাফসিরঃ** মহান আল্লাহর বাণী, **هُدًى لِلْمُتَّقِينَ** এখানে বিশুদ্ধ স্বভাব ও নিখুঁত বিবেকবান ব্যক্তিদেরকে মুত্তাক্বী বলা হয়েছে,তাদের জন্য রয়েছে বিশুদ্ধ রাস্তা, দৃঢ়তা ও হক্বে পৌঁছার একটি বিশুদ্ধ তিরয়াক ও মূল্যবান ব্যবস্থাপত্র।

মহান আল্লাহ অন্যত্রে বলেন, **مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ** আপনি জানেন না কিতাব কি? অর্থাৎ আপনি অবশ্যই কিতাব সম্পর্কে জানেন।

মহান আল্লাহর বাণী, **الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** এখানে বিশুদ্ধ স্বভাব ও নিখুঁত বিবেকবান ব্যক্তিদের উপর যে সকল স্বভাবজাত দায়িত্ব রয়েছে; তা থেকে প্রথম হল অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনা। অর্থাৎ একক সত্তার অধিকারী যাঁর কোন শরীক নেই তার উপর অকাট্যভাবে ঈমান আনা ও বিশ্বাস স্থাপন করা।

বিশ্বাসের বিভিন্ন স্থর রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

ইলমুল ইয়াক্বীন, হাক্কুকল ইয়াক্বীন ও আইনুল ইয়াক্বীন এবং বিশ্বাসের সাথে মৌলিক ও বাহ্যিক সম্পর্ক স্থাপন।

---

[১]. সূরা বাক্বারাঃ ১-৩।

পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক সংযোজনকারী হলেন নবীগণ, যারা সকল স্থানে সমানভাবে বিদ্যমান মহান আল্লাহর সাথে মৌলিক সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তিতে।

পূর্ণাঙ্গ সম্পর্কের অধিকারী হলেন ফেরেশতাগণ যারা প্রতি মুহূর্তে মহান আল্লাহর নির্দেশে উপমা জগতে বিদ্যমান।

মৌলিক ও বাহ্যিক আংশিক সম্পর্কের অধিকারী হলেন, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও আউলিয়ায়ে কেরাম, যারা বরযখ ও মেছালী জগতে বিদ্যমান।

বাহ্যিক আংশিক সম্পর্কের অধিকারী হলেন সাধারণ মু'মিন যারা বরযখ জগতে বিদ্যমান।

**الغيب :** এই শব্দটি সমষ্টিবাচক বা ব্যাপকার্থবাচক। নবীগণকে বিশ্বাস করা, তাঁদের উপর ঈমান আনা আসমানী সকল কিতাব ও সহীফার স্বীকৃতি দিয়ে এর উপর ঈমান আনা, আর আল্লাহর সৃষ্টি ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা, পরকাল সত্য জেনে বিশ্বাসী হওয়া, তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, মৃত্যুর পর হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস করা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। ঈমানের সকল বিষয় এতে রয়েছে। এখানে **الغيب** এর আলিফ লাম ইসতিগরাক্বির জন্য যা সকল **الغيب**কে অন্তর্ভুক্তকারী। তাই এখানে ঈমানের সকল শাখা বর্ণনা রয়েছে, যা পবিত্র কোরআন মু'জেযা হওয়ার দলীল।

যে সকল বস্তু পর্দার আড়ালে আছে কিন্তু শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে তা প্রমাণিত এসব বস্তুর উপরও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

মহান আল্লাহর বাণী: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ এখান থেকে ইসলামের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এবং এটি মুত্তাক্বীনদের দ্বিতীয় গুণ। যা 'মুত্তাক্বীন' এর উপর মা'তুফের অবস্থায় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, হে লোক সকল! মুত্তাক্বীদের দ্বিতীয় দায়িত্ব হল ধ্বংসশীল সৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে কাল্পনিক বস্তু ছেড়ে দিয়ে পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রচিত্তে নামায আদায় করা; চাই তা

সাধারণ নামায হোক বা নির্দিষ্ট নামাজ হোক, চাই তা আভিধানিক নামায হোক বা পারিভাষিক নামায হোক, সাধারণ প্রচলিত নামায হোক বা বিশেষভাবে প্রচলিত নামাজ হোক, বর্ণিত নামাজ হোক বা শরীয়ত সম্মত নামাজ হোক, তা সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে কাকুতি মিনতির সাথে আদায় করতে হবে।

অর্থাৎ, বাইরের ও ভেতরের সকল বিধান ও শর্তমোতাবেক সকল দিক খেয়াল রেখে ধ্যানের সাথে পরিপূর্ণভাবে নামায আদায় করতে হবে। নামায প্রতিষ্ঠাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করে তার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামের সকল আরকানের মাঝে নামায প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে সম্মানিত এবং সকল ইবাদতের মধ্যে তা হল অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বোত্তম। সেখানে মা'বুদের সামনে পরিপূর্ণভাবে বন্দেগী প্রকাশিত হয়। যেখানে বান্দাহ ও আল্লাহর মাঝে ইবাদতের মাধ্যমে কোন পর্দা থাকেনা, তাই নামায প্রতিষ্ঠা সকল ইবাদতের মূল ও আত্মাস্বরূপ এবং নামাজ প্রতিষ্ঠায় দ্বীন প্রতিষ্ঠাও নিহিত। তাই তাকে পৃথকভাবে বর্ণনা দিয়ে ইসলামের রুকন শুরুকরা হয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণী, ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ এটি মুত্তাক্বীদের তৃতীয় দায়িত্ব, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে।

**رَزَقْنَا** এটি **رزق** থেকে নির্গত, অতীতকালীন মুতাকাল্লেমের বহুবচনের সীগাহ। অর্থ আমি জীবিকা দিয়েছি। **رزق** অর্থ জীবিকা, চাই তা দুনিয়াবী হোক বা পরকালের হোক।

**يُنْفِقُونَ** শব্দটি মাফউলের অর্থজ্ঞাপক, যা **إنفاق** থেকে নির্গত, অর্থ খরচ করা, ব্যয় করা। তা বাবে ইফআলের ধাতু। **نفق** অর্থ ছোট সোজা রাস্তা, যাতে শিথিলতা ও বাড়াবাড়ি নেই। বরং মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। এখানে খরচ থেকে শরীয়তের সাধারণ ব্যয় হোক বা বিশেষ ব্যয় হোক। যদিও কিছু মুফাসসিরীন এখানে বিশেষ ব্যয় তথা যাকাতকে নিয়েছেন।

কিন্তু আমার তাহক্বিক্ব হল এখানে উভয় অর্থই প্রযোজ্য। অর্থাৎ, যে কোন শরয়ী ব্যয় এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন মা-বাবার জন্য খরচ করা, বিবি-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, ফকির-মিসকিন ও মুসাফিরের উপর সাধ্যমতে ব্যয় করা। ধর্মীয় কাজ-কর্ম। যেমন মসজিদ, মাদ্‌রাসা ইত্যাদিতে ব্যয় করা, সাধারণ পথে তথা ধর্মীয় জলসা, মাহফিল, দ্বীনদার ব্যক্তিদের জন্য ব্যয় করা; চাই তা দৈনিক হোক, মাসিক হোক, বাৎসরিক হোক, অনির্দিষ্ট হোক বা নির্দিষ্ট হোক, ওয়াজিব হোক বা নফল হোক, সবই জীবিকাকৃত সম্পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যাকাত, ফিতরা, সদকা, খায়রাত ইত্যাদিতে ব্যয় করাও জীবিকাকৃত সম্পদের মধ্যে রয়েছে। ইসলাম জিহাদ করা, রোযা রাখা, হজ্ব করা এভাবে যত ইসলামের বিধি-বিধান রয়েছে, তেমনি দুনিয়াবী ও দ্বীনি সকল কাজে সাধ্যমতে আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে খরচ করা এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এখানে এক প্রকার ইসলামের সকল আরকান, আহকাম ও আক্বায়েদের বর্ণনা করা হয়েছে।

**رزقنا** এর মধ্যে এটাও আওতাভুক্ত যে, নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে অর্জিত সম্পদ থেকে বেঁচে থাকা, অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা সর্বদাই নাজায়েয। এসব উপার্জিত সম্পদ **رزقنا** (আমি জীবিকা দান করেছি) এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অনুরূপভাবে অপচয় ও বেহুদা এবং শরীয়াত নিষিদ্ধ পথে তা ব্যয় করা নিষিদ্ধ। ইহা এমন একটি বাক্য, যাতে হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয বা নিষিদ্ধ সকলকিছু অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তদ্রূপ ফরয, ওয়াজিব, নফল ও মুস্তাহাব জাতীয় সকল কাজ অন্তর্নিহিত রয়েছে। এতে আয়-ব্যয়ের সঠিক মাধ্যম বা রাস্তা বাতলিয়ে দেয়া হয়েছে। কেননা (**رزقنا**) শব্দটির সামষ্টিক অর্থজ্ঞাপক (**مفهوم كلي**) যা এক দৃষ্টিতে ইতিবাচক কুল্লেয়াহ (**موجبة كلية**) এবং অন্যদৃষ্টিতে নেতিবাচক সমষ্টি (**سالبه كليه**) অর্থজ্ঞাপক।

.....

**سبحان الله وبحمده** কেমন জালালী ও জামালী শানওয়ালা মা'বুদের এ বাণী, কতইনা অপরাগ করার ক্ষমতার অধিকারী। মহান আল্লাহ ( **الله أكبر**)

**الله ورسوله اعلم** (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই অধিক জ্ঞাত)।

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾

**অনুবাদঃ** হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! স্মরণ করুন, সেই সময়ের কথা, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, তখন একে অন্যের প্রতি এর অপবাদ চাপিয়ে দিচ্ছিলে এবং তোমরা যা কিছু গোপন করেছিলে, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিলেন। [২]

**তাফসীরঃ** এ আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা হল, বনী ইসরাইলে এক ব্যক্তি অঢেল সম্পদের মালিক ছিল। তার কোন সন্তান ছিল না শুধুমাত্র দু'জন ভাতিজা ছিল। একরাতে সম্পদের লালসায় তারা তাকে হত্যা করে তার লাশকে দুগ্রামের মাঝখানে ফেলে রাখল। অতঃপর হযরত মুসা (আ) এর কাছে এসে তারা এ দু' গ্রামবাসির উপর অভিযোগ করল।

যেহেতু সে গ্রামবাসীরা এ ঘটনা জানত না। তাই তারা মূসা (আ) এর কাছে এ ঘটনার সত্যতা বের করার জন্য আল্লাহর কাছে (সমাধানের নিমিত্তে) দু'আ তালাশ করলেন। মুসা (আ) দু'আ করলে তাদেরকে একটি গাভী যবেহ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হল; তখন লোকেরা বলল, আপনি আমাদের সাথে ঠাট্টা বন্ধ করে সঠিক ঘটনা বলুন। মুসা (আ) বলেন, তা আল্লাহর নির্দেশ। তখন তারা প্রশ্ন করল তবে তা কিরকম? এর কি রঙ? ইত্যাদি? তখন মহান আল্লাহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিলেন। তখন তা কি কি কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। সে গুণের গাভী একটি ইয়াতিম বাচ্চার নিকট পেল; তারা গাভীটি সে ইয়াতিম থেকে চড়া মূল্যে ক্রয় করল। যখন গাভী যবেহ করা হল তখন মহান আল্লাহ বললেন, "তোমরা সে গাভীর এক টুকরা নিয়ে মৃতের গায়ে আঘাত কর" তখন তারা সে গাভীর উরুর অংশ বা কান বা লেজের হাড্ডি মৃতের শরীরে লাগিয়ে দিল তখন সে ব্যক্তি জীবিত হয়ে খুনের পুরো ঘটনা খুলে বলার পর আবার মারা গেল। সে ঘটনায় মহান আল্লাহ একটি গাভীকে তার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ বানানোর

[২]. সূরা বাকারাঃ ৭২।

কারণ হল, যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে মাওকুফ সনদে বর্ণিত, সেখানে আল্লাহর হিকমাত বিদ্যমান ছিল তা হল বনী ইসরাইলের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল যার একটি ছোট বাচ্চা ছিল এবং তার একটি গরুর বাচ্চা ছিল। সে ব্যক্তির মৃত্যু যখন নিকটে আসল তখন সে নিজের বাচ্চার কথা চিন্তা করে তার ঘরে যে গরুর বাচ্চাটি আছে, তাকে জঙ্গলে নিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন হে আল্লাহ! এই গরুর বাচ্চা আপনার নিরাপত্তায় দিলাম আমার সন্তানের জন্য। যতদিন সে বড় হবেনা এটি আপনার নিরাপত্তায় থাকবে। ঘটনা তাই হল, সে গরুজঙ্গলে থাকত; যে কাউকে দেখলে পালিয়ে যেত।[৩]

এ থেকে বুঝা যায় আল্লাহর ওলীদের শান অনেক বড়! তাঁদের জন্য আল্লাহ তাঁর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। যেমন: এই গরুটি একজন ওলীর হওয়ার কারণে সেখানে মহান আল্লাহর কুদরত প্রকাশ করলেন তা দ্বারা একজন মৃতকে জীবিত করলেন এবং আল্লাহর ওলীদের সন্তানও তাঁর কাছে প্রিয়; তাই তাঁর জন্য গরুর বাচ্চাকে নিজে লালন পালন করলেন। এই ঘটনার কারণেই এই সূরার নাম বাক্বারা রাখা হয়েছে। ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও বহু মর্যাদাসম্পন্ন একটি কুরআনী ঘটনা।

**الله ورسوله اعلم** (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই অধিক জ্ঞাত)।

---

[৩]. তাফসিরে মাযহারী, ১/৪২।

.....

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

## ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى﴾

**অনুবাদঃ** হে মু'মিনগণ, তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে হেফাযত করো অর্থাৎ, নামাযে সবসময় অধিষ্ঠিত থাক, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযকে।[৪]

**তাফসীরঃ** মহান আল্লাহর বাণী, **وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى** এখানে **وُسْطَى** দ্বারা কি উদ্দেশ্য? সে ব্যাপারে আলিমদের মত্যনৈক্য রয়েছে। কেউ তা থেকে এশার নামাজ, কেউ মাগরিবের নামায, কেউ বা যোহরের নামায আবার কেউ ফযরের নামায উদ্দেশ্য নিয়েছেন; অধিকাংশ আলেমই আসরের নামায উদ্দেশ্য নিয়েছেন, এটাই প্রাধান্য। প্রত্যেকের নিকট তাঁদের দলীল রয়েছে; এসব দলীল শক্তিশালী বা দুর্বলের যদিও হুকুম রাখে।

আমি অধমের তাহ্ক্বীক হল, এখানে 'সালাতুল উসতা' বলতে প্রত্যেক ঐ ওয়াক্ত নামাজকে বুঝানো হয়েছে, পাঁচওয়াক্ত নামাজের মধ্যে যেসব ওয়াক্তে মানুষের স্বীয় তৃপ্তি, লেনদেন কিংবা ব্যস্ততার কারণে বেখেয়ালী ভাবে নামাজের নির্দিষ্ট ওয়াক্ত চলে যায় কিংবা ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়, বিশেষ করে সে সকল ওয়াক্ত নামাজের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব ও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে ওয়াক্ত নামাজ অমনোযোগ কিংবা অবহেলার কারণে ছুটে যায়, সে ব্যক্তির জন্য 'সালাতুল উসতা' দ্বারা সে ওয়াক্ত নামাজই উদ্দেশ্য।

---

[৪]. সূরা বাক্বারাঃ ২৩৮।

আমার নিকট আরেকটি প্রাধান্য মত হল **صَّلَوٰةِ الْوُسْطَى** দ্বারা ফজরের নামায উদ্দেশ্য। কেননা অধিকাংশেরই ঘুমের কারণে এ নামায ছুটে যায়; এ ওয়াক্ত নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সে সময় হল রাতের অন্ধকার দূর হওয়া এবং সূর্য উদয় হওয়ার সময়। এ নামাজের সময় অধিকাংশ মানুষেরই ফউত হয়ে থাকে। মানবীয় হাজত পূরণ করতে করতে অনেক সময় সূর্য উদয় হয়ে যায়, তাই সঠিক সময়ে নামায আদায় করা কঠিন হয়। তাই সে সঠিক সময়ের নামায আদায় করার জন্য গুরুত্বারূপ করা হয়েছে। অন্যান্য ওয়াক্ত থেকে এ ওয়াক্ত নামাজের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সাধারণত দিনের নামাযে, দু' ঈদ ও জুমা ব্যতীত ক্বেরাত আস্তে পড়ার নির্দেশ রয়েছে। রাতের নামাযে ক্বিরাত প্রকাশ্যভাবে পড়ার জন্য বলা হয়েছে; কিন্তু ফজরের নামাযে ক্বেরাত প্রকাশ্যভাবে পড়ার জন্য বলা হয়েছে অথচ সে সময়ে নামাজ আস্তে পড়া উচিত ছিল; কেননা সে সময় রাতের অন্ধকার চলে যায় ও দিনের প্রহর শুরুহয় তাই তা দিনের অংশ। আর দিনের নামাযে ক্বেরাত আস্তে পড়তে হয় তা সত্ত্বেও সে সময়ে ক্বেরাত উচ্চস্বরে পড়তে হয়। যেমন মাগরিবের সময় রাত শুরুহওয়ার কারণে ক্বেরাত উচ্চস্বরে পড়তে হয়। তাই এ সকল যুক্তির আলোকে **صَلَوٰة الْوُسْطَى** দ্বারা ফজরের নামাজ উদ্দেশ্য হওয়াই প্রাধান্য।

তাই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় "হে মু'মিনগণ! তোমরা পাঁচওয়াক্ত নামাজকে ভালভাবে সংরক্ষণ কর অর্থাৎ সঠিক সময়ে প্রতি ওয়াক্ত নামাজ আদায় কর; বিশেষ করে ফজরের নামাযের প্রতি ভালভাবে খেয়াল রাখবে, ফজর হতে না হতেই তোমরা শয়ন থেকে উঠে পড়, প্রাকৃতিক হাজত শেষ করে গাফলতি-অলসতা নিরসন করে ফজরের নামায জামাতের সাথে একাগ্রচিত্তে আদায় কর এবং এমন দেরী করে ঘুম থেকে উঠো না, যাতে হাজাত সেরে নিতে নিতে সূর্য উদয় হয়ে যায় এবং জামাতের ওয়াক্ত ও

ফজরের সময় চলে যায়। হাদীছ শরীফে এসেছে ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করাতে রাত ভর জেগে থেকে ইবাদত করার সমান পূণ্য পাওয়া যায়।

আর ফজরের নামায মাত্র দু'রাকাত, যাতে মানুষের জন্য হালকা হয় ও ভারী না হয়; সঠিক সময়ে আদায় করা সম্ভব হয়। অন্যান্য সুন্নাতের তুলনায় এ নামাজের সুন্নাতেরও অধিক গুরুত্ব রয়েছে।

অথবা **صَلٰوةِ الْوُسْطٰى** দ্বারা পাঁচওয়াক্ত ফরয নামায উদ্দেশ্য। কেননা প্রত্যেক ফরয নামাজের আগে পরে কোন না কোন মাযহাবে নফল ও সুন্নাত নামায রয়েছে, সে হিসাবে তা মাঝে রয়েছে তাই অধিকাংশের দিকে লক্ষ করে তাকে মাঝের নামায বলা হয়েছে (এটি দুর্বল ব্যাখ্যা)।

.....

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

## ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾

**অনুবাদঃ** নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আলো এসেছে অর্থাৎ হক্ব প্রকাশ করার জন্য ও বাতিল মিঠানোর জন্য এবং আরো এসেছে সুস্পষ্ট কিতাব বা আল-কুরআন।[৫]

**তাফসীরঃ** কিছু কিছু লোক বলেন, এখানে নূর শব্দ দ্বারা কোরআন করীম উদ্দেশ্য এবং আত্ফ তাফসিরের জন্য এসেছে। এ আয়াতের তাফসিরে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (মৃত: ৬০৬) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কয়েকটি মতামত রয়েছে।

**وَفِيهِ أَقْوَالٌ: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالنُّورِ مُحَمَّدٌ وَبِالْكِتَابِ الْقُرْآنُ، وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِالنُّورِ الْإِسْلَامُ، وَبِالْكِتَابِ الْقُرْآنُ. الثَّالِثُ: النُّورُ/ وَالْكِتَابُ هُوَ الْقُرْآنُ، وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْعَطْفَ يُوجِبُ الْمُغَايَرَةَ ج١١ ص:.٣٢٧**

১ম মত: এখানে নূর দ্বারা মুহাম্মদ ﷺকে এবং কিতাব দ্বারা কোরআন মজিদকে বুঝানো হয়েছে।

২য় মত: নূর দ্বারা ইসলাম ও কিতাব দ্বারা কোরআন করিম উদ্দেশ্য।

৩য় মত: নূর ও কিতাব উভয় থেকে কোরআন করিম উদ্দেশ্য। এটি দুর্বল মত। কেননা আত্ফ ভিন্নতা চায়। ইমাম রাযি এই তৃতীয় মতকে দুর্বল বলেছেন।

হযরত সায়্যিদ মাহমুদ আলূসি হানাফি বাগদাদি (রহ:) বলেন,

---

[৫]. সূরা মায়িদা: ১৫

**ولا بعيد عندي أن يراد بالنور والكتاب المبين النبي صلّى الله عليه وسلّم، والعطف عليه كالعطف على ما قاله الجبائي.**

এখানে নূর ও কিতাব দ্বারা নবী করীম ﷺকে উদ্দেশ্য নেওয়া অসম্ভব নয়। আর এখানে **عطف** টি হবে **الجبائي** এর উক্তির স্বপক্ষে অর্থাৎ **عطف تفسيرى**।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব বসরী মু'তাজেলী কাশ্শাফ প্রণেতা আল্লামা জামাখশরীর মতকে অনুসরণ করে বলেন,

**ولا شكّ في صحة إطلاق كل عليه الصلاة والسلام،ج৬ ص:৯৯.**

অর্থাৎ, নূর ও কিতাব উভয় শব্দ দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য নেওয়া অসম্ভব নয়। তখন আত্ফ তাফসীরি হবে।

ইমাম মুজাদ্দেদে আলফে আউয়াল 'মোল্লাআলী ক্বারী হানাফি (রাহ:)' এ আয়াতের তাফসিরে শরহে শেফা কিতাবে লিখেন:

**(جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ) أي لظهور الحق وإبطال الباطل وأطلق عليه الصلاة والسلام، لأنّه يهتدي به من الظلمات إلى النور (وَكِتابٌ مُبِينٌ [المائدة: ١٥] بين الإعجاز ومبين الأحكام، وهذا شاهد للمدّعي الأول وبيانه أنَّ الأصل في العطف المغايرة شرح شفا ج১ ص:৫১.**

**অর্থ:** "নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নূর এসেছে" অর্থাৎ হক্ব প্রকাশের জন্য ও বাতিলকে মিঠানোর জন্য এবং নবী করীম ﷺ কে নূর বলার কারণ এঁর দ্বারা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথপ্রদর্শন করা হয়

এবং স্পষ্ট কিতাব যার অলৌকিকতা স্পষ্ট ও বিধি-বিধান সুবিস্তারিত এবং তা প্রথম দাবীর পক্ষে দলীল, যার ব্যাখ্যা হল আতফের মূলনীতি- যা উভয়ের মাঝে ভিন্নতাকে বুঝিয়ে থাকে। অর্থাৎ, দুই শব্দের মাঝখানে ওয়াও **(واو)** আসলে ভিন্নতা হওয়াটাই নিয়ম এবং আত্ফে তাফসিরি হল রূপক।[৬]

যারা উসূলুস শাশী কিতাব পড়ে (ছাত্ররা) তারাও জানে যে, কোন শব্দ থেকে রূপক অর্থ নেওয়ার চেয়ে মূল অর্থ নেওয়াই আসল। কোন অসম্ভবতা ব্যতীত **واو** কে আত্ফে তাফসিরি বিবেচনা করা জ্ঞান বিবর্জিত লোকদের কাজ, যাদেরকে পন্ডিত মূর্খ বলা হয়।

ইমাম মোল্লাআলী ক্বারী আত্ফে তাফসিরের উত্তরে বলেন,

**وقد حاول بعض المفسّرين بأنه من باب الجمع بين الوصفين باعتبار تغايرهما اللفظي وأن المراد بهما القرآن وقد يقال في مقابلهم وأي مانع من أن يجعل النعمتان للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. فإنّه نور عظيمٌ لكمال ظهوره بين الأنوار وكتاب مبين حيث أنّه جامع لجميع الأسرار ومظهر للأحكام والأحوال والأخبار. جلد الاول ، صفحه ٥١.**

অর্থাৎ, কতিপয় মুফাসসিরগণ শাব্দিক পার্থক্য হওয়ার ভিত্তিতে দুটি গুণকে একত্রিত হওয়ার মতকে সমর্থন দিয়েছেন। আর তাদের প্রতি উত্তরে বলা যাবে যে, এমন কোন প্রতিবন্ধকতা আছে যে, উক্ত নি'আমতদ্বয় দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করতে নিষেধ করেছে? অর্থাৎ উভয় নি'আমত দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তিনি এমন এক মহান নূর, যা অন্যান্য নূরের মাঝে পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ পেয়েছে। আর তিনি **كتاب مبين** বা সুস্পষ্ট

[৬]. শরহে শেফা শরীফ, ১/৫১

কিতাবও বটে। কেননা তিনি সমস্ত ভেদের একত্রিতকারী, বিভিন্ন বিধি-বিধান, অবস্থা বলা ও সংবাদসমূহের বহিঃপ্রকাশকারী।[৭]

হযরত ইমাম মোল্লাআলী ক্বারী ও সায়্যিদ মাহমুদ আলুসী হানাফী দু'জনই নূর ও কিতাব দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তাকে বুঝিয়েছেন। যারা রাসূলের বড়ত্ব-মহত্ব রেসালত ও নবুওয়তকে অস্বীকার করতে চায়; তাদের ধারণা দুইটা তো দেওবন্দীদের ইলমে পৃথক বস্তু একটা থেকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য নয়? তাই বলা যায় তাদের প্রেমে কতটুকু সততা ও মৌলিকতা বিদ্যমান?

আল্লামা সায়্যিদ মাহমুদ আলূসী হানাফী বলেন,

**قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ عظيم وهو نور الأنوار والنبي المختار صلّى الله عليه وسلّم، وإلى هذا ذهب قتادة، واختاره الزجاج،**

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান নূর এসেছে। সে **নূর** হল সমস্ত নূরের উৎস ও নাবীয়্যুল মুখতার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত কাতাদা (রাহ:) এ রকম বলেছেন। আর হযরত যুজাজ (রাহ:) এ মতকে সমর্থন করেছেন।

এ থেকে বুঝা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নূরের মূল। এই ভ্রষ্ট আক্বীদার লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধুমাত্র হিদায়তের দিক দিয়ে নূর মানে; বাহ্যিক দিক দিয়ে নূর মানতে রাজী নয়। বাস্তব সত্য হল তিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ প্রত্যেক প্রকার নূরের সমষ্টি; তাঁর থেকে বিভিন্ন প্রকার নূরের চাহিদার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যখন মনুষ্যত্বতা প্রাধান্য পায় তখন মানুষের সিফাত প্রকাশিত হয় এবং যখন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নূরের প্রাধান্যতা হয় তখন সে ধরনের সিফাত প্রকাশিত হয়।

---

[৭]. শরহে শেফা, খন্ড: ১, পৃ.৫১

তাফসীরে সাবীতে রয়েছে,

**و سمى نورا لأنّه ينّور البصائر و يهديها للرشاد و لانه أصل كل نور حسى و معنوى**

অর্থ: তাঁকে নূর বলার কারণ তিনি দৃষ্টিসমূহকে আলোকিত করেন তাদেরকে হিদায়তের আলো দান করেন এবং তিনি প্রত্যেক আভ্যন্তরীণ/আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক নূরের মূল।

তাফসীরে জালালাইনে রয়েছে,

**مِنَ اللهِ نُوْرٌ هو نور النبى صلى الله عليه و سلم**

অর্থ: এখানে নূর দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর উদ্দেশ্য।

তাফসীরে বায়যাভী শরীফে এসেছে,

**من الله نور هو نور النبى صلى الله عليه و سلم يريد بالنور محمد صلّى الله عليه وسلّم.**

**অর্থ:** আয়াতে নূর থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জাত উদ্দেশ্য।[৮]

তাফসীরে আবূস সাউদে এসেছে,

**المرادُ بالأوّل هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبالثاني القرآن**

এখানে নূর থেকে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কিতাব থেকে কোরাআনে করীম উদ্দেশ্য।[৯]

---

[৮]. শরহে শেফা-খ: ২ পৃ: ১২০।

**প্রশ্নঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা আয়াতের শুরুতে এসেছে মহান আল্লাহ বলেছেন,**

**يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ**

**অর্থঃ** হে আহলে কিতাবিগণ! তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসেছেন যিনি তোমাদের জন্য বর্ণনা দেন। সুতরাং এখানে নূর থেকে উদ্দেশ্য রাসূল হবে না?

মৌলভী আশরাফ আলী থানভী "রেসালাতুন নূরে" লিখেন, নূর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সে তাফসীরের কারণ হল এর উপরে রাসূলের আলোচনা হয়েছে এ উভয় স্থানে **جاء** (এসেছে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; তাই উভয়টার কর্তা এক হবে অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[১০]

**দ্বিতীয় প্রশ্ন হলঃ** এখানে দ্বিবচনের সর্বনাম আনা দরকার ছিল যদি নূর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেওয়া হয়। অথচ সর্বনাম আনা হয়েছে এক বচনের তাই এখানে নূর দ্বারা কোরআন উদ্দেশ্য।

**জবাবঃ** কোরআন মজীদে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে কয়েকটি বস্তুর দিকে একবচনের সর্বনাম ফিরানো হয়েছে; কিন্তু রেসালতের দুশমন ও নবুয়তের শত্রুদের কি চিকিৎসা হতে পারে যে পুরো কোরআন মজীদে তাদের শুধু এই স্থানেই খটকা লেগেছে?

আল্লামা আবূ সাউদ উক্ত আয়াতের তাফসিরে বলেন,

**{يَهْدِى بِهِ الله} توحيد الضمير المجرور لاتحّاد المرجَع بالذات أو لكونهما في حكم الواحد أو أريد يهدي بما ذُكر**

---

[৯]. শরহে শেফা-খ:৩ পৃ:১৮।

[১০]. রেসালাতুন নূর।

**অর্থঃ** সর্বনামকে একবচন আনার কারণ হয়ত দুটার প্রত্যবর্তন স্থল সত্তাগত ভাবে এক। কেননা কোরআনের বিধান সম্বলিত কোন সত্তা চিন্তা করলে তাঁকেই পাওয়া যাবে এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর কোন দ্বিতীয় প্রতিচ্ছবি বস্তু তালাশ করলে তখন তা কোরআন করীম হবে বা দুটিই এক বস্তুর বিধানে; কেননা দুটারই অনুসরণ ওয়াজিব বা তার থেকে উল্লেখিত বিষয় উদ্দেশ্য।[১১]

সাধারণত এধরণের উত্তর মুফাস্সিরগণ দিয়ে থাকেন। শায়খ আবুস সাউদ, আনওয়ারুত তানজিলে আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বায়যাবী, আল্লামা ইসামাইল হক্কী হানাফী, রুহুল বয়ান, তাফসিরে খাযেন প্রমুখে এ ধরনের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইমাম মোল্লাআলী ক্বারী হানাফী "শরহে শেফা" কিতাবে খুব চমৎকার উত্তর দিয়েছেন, শানে মোস্তাফা ﷺ এর দুশমনরা তো তীর নিক্ষেপ করে বসে থাকেনি, তারা আশেকানে নবুয়তের দলীলসমূহের বিপরীতে কোমর বেঁধে আছে তাদেরকে বলতে চাই যদি একবচনের সর্বনামের প্রত্যবর্তনস্থল যদি এক হতে হয়, তা হলে এক বচনের সর্বনাম থেকে উভয়টা নিতে কে বলে বরং আয়াতের আগের পরের বর্ণনা দ্বারা আমরা নিতে পারি সেই একবচনের সর্বনাম থেকে শুধুমাত্র নবী করীম ﷺ। এই জবাবটি মোল্লাআলী কারী (রহ) শরহে শিফাতে দিয়েছেন এবং আল্লামা সায়্যিদ মাহমুদ আলুসী (রহ) তার বিখ্যাত তাফসীর রুহুল মাআনীতে উলে- খ করেনঃ

**توحيد الضمير لاتحاد الذات أو لكونهما فى الوحد أو لكون المراد يهدي بما ذكر**

ইমাম নাসাফী হানাফী তার তাফসীর 'মাদারিকুত তানযিলে' বলেছেন, নুর থেকে মুহাম্মদ ﷺ; কেননা তাঁর মাধ্যমে হেদায়াত লাভ করা হয় যেভাবে

[১১]. শরহে শেফা-খঃ৩ পৃঃ১৮।

তাকে চেরাগ বলা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য তাফসিরে রুহুল মা'আনী দেখুন।[১২]

﴿**قد جاءكم من الله نور**﴾ এখানে **قد** শব্দটি গুরুত্ব বুঝানোর জন্য এসেছে **جاء** একটি ক্রিয়া এর জন্য একটি কর্তার প্রয়োজন যে আসতে পারে তাই তা শরীর বিশিষ্ট হওয়া দরকার নতুবা সে কিভাবে আসবে? যদি **نور** দ্বারা কোরআন নেওয়া হয় তখন **انزال تنزيل نزول** বা অবতীর্ণ অর্থবোধক শব্দ দরকার, **(جاء)** আসা অর্থ ব্যবহার ঠিক হবে না; কেননা আসার জন্য শরীর বিশিষ্ট প্রাণী হওয়া প্রয়োজন; তখনই আসার অর্থ বাস্তবায়িত হবে।

আরেকটি কথা হল, এখানে নূরের কথা আগে কিতাবের কথা পরে আনা হয়েছে তা কেন? তার কারণ হল অজ্ঞদের সতর্ক করার জন্য করা হয়েছে যারা নবী করীম ﷺ কে বশর বলে চিৎকার করে; কেননা বশর তো বিভিন্ন উপাদান দিয়ে তৈরী যা বিভিন্ন দোষে দোষী একটি স্থূল প্রাণী।

মা'বুদ তা নিরসন করার জন্য নূরকে আগে এনেছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ এখানে সূক্ষ্ম শরীরের বর্ণনা দেওয়ার জন্য নূরকে আগে এনেছেন। অর্থাৎ, তোমাদের নিকট তোমাদের মত একটি সূক্ষ নূরানী শরীর এসেছেন যিনি তোমাদের জন্য হিদয়াতের পথপ্রদর্শক কুরআন দ্বারা। তাই উভয় নূর এখানে এক। তাঁর শরীরের সূক্ষ্ম হওয়াতে তা এক বস্তুতে পরিণত হয়েছে। তাই এখানে সেই **(جاء)** আসা শব্দ ব্যবহার করা সঠিক হয়েছে। এখানে নূর নূরানী শরীর হওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তাই এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তা ভারী শরীর থেকে পবিত্র বরং তিনি নূরই নূর, তিনি সত্তার দিক দিয়েও নূর এবং গুণাবলীর দিক দিয়েও নূর। তাই তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। যাতে উভয়টার উদ্দেশ্য এক হয়। শুধুমাত্র ভাষার ভিন্নতা রয়েছে। তাই তা সত্তাগতভাবে ভিন্ন নয়, নতুবা **(جاء)** আসা শব্দ ব্যবহার সঠিক হবে না। অহী অবতীর্ণের সময় বাশারিয়্যাত উঠিয়ে নেওয়া হয় তখন নূরানিয়্যাত বিদ্যমান থাকে।

---

[১২]. রুহুল মাআনী: খ: ৬ পৃ:৯৮।

.....

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

**﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾**

**অনুবাদঃ** নিশ্চয়ই ইহা আমার সোজা রাস্তা, এর উপর তোমরা চল। অন্য কোন রাস্তায় চলো না। যদি চলো, তবে মূল (সত্যের) রাস্তা থেকে তোমাদেরকে পৃথক করে দিবে।[১৩]

**তাফসীরঃ** তাফসীরে মাদারেকে এসেছে, নবী করীম ﷺ একটি রেখা টেনেছেন এবং বললেন, এটি সরল পথ, এটিই আল্লাহর রাস্তা এর অনুসরণ করো, অতঃপর এর উভয় পার্শে ছয়টি করে রেখা টানলেন এবং বললেন, এ সকল শয়তানের রাস্তা, প্রত্যেক রাস্তায় শয়তান রয়েছে; সে মানুষকে নিজের দিকে আহবান করে তা থেকে বিরত থাক। অতঃপর এ আয়াত পাঠ করে শুনালেন।

মাদারেক প্রণেতা বলেন, সে বার রাস্তার প্রত্যেকটি থেকে ছয়টি রাস্তা বের হয়েছে এভাবে পথভ্রষ্টের ৭২টি রাস্তা বের হয়ে আসবে।

মাওয়াকেফ শরীফে বিস্তারিত এভাবে এসেছে যে, ইসলামী ফিরকা আটটি মুতাজেলা, শিয়া, খাওয়ারেজ, মুর্জিয়া, নাজ্জারিয়া, জাবারিয়া, মুশাব্বা, নাজিয়া, অতঃপর এসকল দল বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত যে, এক এক দলের অনেক উপদল সৃষ্টি হয়েছে।

তাই মুতাজেলা ২০টি উপদলে বিভক্ত হয়েছে, শিয়া ২২ উপদলে বিভক্ত হয়েছে। খারেজী ২০ উপদলে বিভক্ত হয়েছে, মুর্জিয়া হয়েছে ৫ উপদলে বিভক্ত, নাজ্জারিয়া তিন উপদলে, জাবারিয়া ও মুশাব্বা কোন উপদলে

---

[১৩]. সূরা আন'আম: ১৫৩

বিভক্ত হয়নি, এভাবে ৭২ দল বের হল। তারা সকলে জাহান্নামী একটি দল জান্নাতী, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, সর্বমোট ৭৩ দল।[১৪]

শায়খ আল্লামা মুহাক্কিক আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী 'মাওয়াকেফের' কথাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা হাদিছে ডানে বামে রেখা টানা তো প্রমাণিত কিন্তু কত সংখ্যা তা অনির্দিষ্ট। 'মাদারেক শরীফে' যে হাদিছ বর্ণিত, সেখানে সোজা রেখার ডানে বামে ছয়টি করে বারটির কথা আছে; যা দ্বারা পথভ্রষ্টের দল বারটি বুঝা যাচ্ছে এরপরে সে বারটি কিভাবে ৭২টি হল তা থেকে হাদিছ নিশ্চুপ।

মাদারেক প্রণেতার দাবী, সে বারটি থেকে ছয়টি করে ৭২ দল হওয়া হাদিছ ও ইতিহাস প্রমাণ করে না। হ্যাঁ পথভ্রষ্টের বারটি দল হওয়া সহিহ হাদিছ দ্বারা প্রমাণিত। এখানে বারটি সীমিত বুঝানোর জন্য নয় বরং অনুধাবন ও সাদৃশ্যস্বরূপ উলে- খ করা হয়েছে। মাওয়াকেফের সমর্থনে হাদিছে সংক্ষিপ্তাকারে বুঝা যায়। যা ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

## ثنتان و سبعون فى النار و واحد فى الجنة و هى الجماعة (مشكوٰة)

**অর্থঃ** আমার উম্মত থেকে ৭৩ দল হবে ৭২ দল জাহান্নামে যাবে, একটি জান্নাতে যাবে তারা হল সাহাবাদের আনুসারীদল।

আর তার সমর্থনে ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে। তাই শায়খ মুহাক্কিক আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহ) বলেন, মাওয়াকেফ প্রণেতার কথার প্রাধান্যতা রয়েছে সেই পথভ্রষ্ট ৭২ দলও ইসলামের দাবিদার, সকলে হক্বের দাবী করে তারা মুসলমানদের মত কাজ করে মুক্তির গ্যারান্টি দাবী করে অথচ হাদিছে এ সকল দলকে জাহান্নামী বলা হয়েছে এবং মুক্ত শুধু একদলের কথা বলা হয়েছে। সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দলের মাপকাঠি হল: **ما أنا**

[১৪]. আনওয়ারুল হাদিছ, আব্দুল আযিয মুহাদ্দিছ মোবারকপুরি।

**عليه وأصحابى** যার উপর রাসূল এবং সাহাবা রয়েছেন। এটি তাদের বৈশিষ্ট্য তারাই নিয়মনীতিতে রয়েছেন। রাসূল এবং সাহাবায়ে কেরাম যে পথে আছেন তাই শ্রেষ্ঠ ও সোজা পথ। সেই বাহাত্তর দল আকায়েদ ও নীতি বহির্ভুত হয়ে পৃথক পৃথক রাস্তা গ্রহণ করেছে। সে সকল ভ্রান্তদল যেভাবে ইসলামের দাবী করে তেমনি তারা বড় গলায় রাসূল ও সাহাবাদের অনুসারী দাবী করে এবং ধোঁকাবাজির মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানকে প্রতারিত করে সোজা রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে। তাই আমি সরল পথের বর্ণনা দিচ্ছি যাতে হক্ব বাতিল বিভাজন হয়ে যায়।

এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন দাবী দলিলবিহীন গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু ধোঁকা দিয়ে কোন দাবী প্রমাণিত হয় না বরং দাবীর স্বপক্ষে কোরআন-সুন্নাহ ও যুক্তি ভিত্তিক শরয়ী ও প্রচলিত দলীল পেশ করতে হয়; যদি সে মুক্তিপ্রাপ্ত দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হয় তখন তার দলিল হল, এ পবিত্র ধর্ম আমাদের নিকট বর্ণনার মাধ্যমে পৌঁছেছে, তা নস ভিত্তিক যুক্তিভিত্তক নয় এবং বিভিন্ন মুতাওয়াতির হাদিছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে হাদিছের অনুসন্ধান দ্বারা বুঝা যায় সালফে সালেহীন সাহাবা-তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের এই বিশ্বাসই ছিল। তারা সকলে আহেল সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা মতে ছিলেন, এ সকল বাতিল ৭২ দল **قرن أولىٰ** তথা প্রথম শতাব্দির পরে জন্মেছে।

সাহাবা, তাবেঈন, তবে-তাবেঈন ও সালফে সালেহীনের কেউ তাদের আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিলেন না বরং যখনই এ সকল দল প্রকাশ পেয়েছে সলফে সালেহিন তাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তাদেরকে রদ করেছেন। সিহাহ্ সিত্তার কিতাব এবং এগুলো ব্যতীত আরো সকল হাদিছের কিতাব; যার উপর ইসলামের ভিত্তি এ সকল কিতাবের লিখকগণ তথা ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী (রাহ) প্রমুখ তারা সকলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। মুজতাহিদ ইমামগণ তথা ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রা)সহ সকলে

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মূলনীতির উপর ছিলেন। তর্কশাস্ত্রের মূলনীতির ইমামগণ; আশায়েরা, মাতুরিদিয়া সকলে আহলে সুন্নাতের আক্বীদা ও মূলনীতিকে সমর্থন ও তাহকীক করেছেন যে মূলনীতি ও বিশ্বাস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈগণের ছিল। যার উপর সলফে সালেহিনের ইজাম হয়েছে। তাই সেই মুক্তি প্রাপ্ত দলের নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যদিও নামটি নতুন মনে হয় তবে তাদের বিশ্বাস ও কাজ পুরাতন।

পূর্ববর্তী সুফিয়ায়ে কেরাম, মুহাক্কিকীন মাশায়েখে ‘ইযাম, সকল আবিদ ও যাহিদ ও আউলিয়ায়ে কেরাম যাদের বেলায়েত সর্বজনস্বীকৃত ও যাদের তাকওয়া স্বতঃসিদ্ধ সকলে এ দলে ছিলেন। তাদের কিতাব পড়লে তা ফুটে উঠে।

**সারকথা:** নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, মুজতাহিদ ইমামগণ, সকল মুহাদ্দিছিন, সকল মুতাকাল্লেমিন সুফিয়ায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে ‘ইযাম সকলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ধারক বাহক ও পূর্ণমাত্রায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: **ما أنا عليه وأصحابى** এর সত্যায়ন শুধুমাত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। সেখানে কারো নিকট সামান্যও যদি ত্রট্টি থাকে, তখন হাদিছের কিতাব, তাফসির; কালামশাস্ত্র, ফিকাহশাস্ত্র, তাসাউফ, সীরাত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ইত্যাদি যদি গবেষণা করা হয়, তবে এ কথাই প্রমাণিত হবে যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতই হলো **ما أنا عليه وأصحابى** এ হাদিস দ্বারা সত্যায়িত দল। এ ছাড়া বাকী সকল মাযহাব বাতিল; তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য বাহ্যিক ও অর্থগত রয়েছে, সকল দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা তাদের থেকে ভিন্ন।

.....

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾

**অনুবাদঃ** তাদের অধিকাংশ এমন মু'মিন যারা শিরকে লিপ্ত অর্থাৎ, শরীয়তে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহ্যিক সূরত কবুল করা উদ্দেশ্য নয়।[১৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾

**অর্থঃ** তারা ঈমান এনেছে মূর্তির উপর ও শয়তানের উপর।

এখানে ঈমান শব্দ ব্যবহার তাদের বদনাম স্বরূপ করা হয়েছে। যেমন বলা হয় তার ইমান হল কূফরি।[১৬]

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾

**অর্থঃ** নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউসে আতিথেয়তার ব্যবস্থা হবে।[১৭]

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾

**অর্থঃ** যদি মু'মিনদের দু'টি দল মারামারি করে।[১৮]

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾

**অর্থঃ** যারা ঈমান এনছে এবং তাদের ঈমানে কোন অন্যায় মিশ্রিত করেনি।[১৯]

---

[১৫]. সূরা ইউসুফ: ১০৬

[১৬]. সূরা নিসা:৫১।

[১৭]. সূরা ক্বাহফ:১০৭।

[১৮]. সূরা হুজরাত:৯।

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا﴾

**অর্থ:** যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি।[২০]

আমি আল্লাহর অনুগ্রহে নিম্নে ঈমানের অর্থ উদ্দেশ্য এবং এর বিশেষণ ও প্রকারভেদ তুলে ধরব।

হামজার নীচে যের দিয়ে অর্থ হবে ঈমানের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস করা বা সাধারণ বিশ্বাস করা, অন্তরে আক্বীদা বা দৃঢ় বিশ্বাস করা ও মুখে স্বীকার করা। অর্থাৎ, খবরদাতার হুকুমকে বিশ্বাস করতে হবে অন্তর দিয়ে এবং তাকে সত্যবাদী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

ঈমান **(إيمان)** বাবে ইফআলের ধাতু ওজন হল **اِفْعَالٌ** এর মূল বর্ণ **أمن** তথা শান্তি থেকে নির্গত।

তাই ঈমান আনার অর্থ হল, যার প্রতি ঈমান আনা হবে তাকে মিথ্যা ও বিরোধিতা থেকে শান্তি দেওয়া হবে। ইমান কখনো 'লাম' দ্বারা **(متعدي)** সকর্মক হয় কখনো 'বা' দ্বারা **(متعدي)** সকর্মক হয়; প্রথম পদ্ধতি লাম দ্বারা **(متعدي)** সকর্মক হলে এতে ইয়াকীন, ইযআন ও মুহকামের অর্থ নিহীত এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি তথা 'বা' এ সময় স্বীকার করা, মেনে নেওয়া **(انقياد)** আনুগত্যের অর্থ নেওয়া হয় যা দ্বারা বুঝায় স্বীকার ব্যতীত ঈমান সঠিক নয়। কখনো **إيمان** (ঈমান) শব্দটি **(حقيقة عرفية)** প্রচলিত বাস্তবতা বা **(مجازوثوق)** রূপক বিশ্বাসের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেননা যারা তার প্রতি বিশ্বস্ত হবে তারা নিরাপত্তা লাভ করবে।

শরীয়তের পরিভাষায়, ঈমান অর্থ নবী করীম ﷺ এর সকল শিক্ষাকে বিশ্বাস করা যা তার থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত, যা তাঁর থেকে সংক্ষেপে

---

[১৯]. সূরা আন'আম: ৮২।

[২০]. সূরা আনফাল:৭২।

বর্ণিত তা সেভাবে এবং যা বিস্তারিত ভাবে প্রমাণিত তা বিস্তারিতভাবে বিশ্বাস করতে হবে এটিই জমহুর মুহাক্কিকীনের মাযহাব।[২১]

এ থেকে বুঝা গেল, আল্লাহর উপর ঈমান রিসালাতের প্রতি ঈমানের উপর নির্ভর করে। যদি রিসালাতের প্রতি ঈমান নির্ভেজাল মুহাব্বত দুর্বল হয় তখন আল্লাহর প্রতি ঈমান ও দূর্বল হবে। তাই প্রথমে রিসালাতের প্রতি ঈমান দৃঢ়তার সাথে আনতে হবে। তখনই আল্লাহর প্রতি ঈমান অর্জিত ও নসীব হবে।

**ঈমান দু প্রকারঃ**

১. ইজমালী বা তাফসিলবিহীন। ২. তাফসিলী বা বিস্তারিত।

**ঈমানে মুজমাল হলঃ** আল্লাহর ব্যাপারে বিশ্বাস রাখতে হবে, আল্লাহর সত্তায় সকল পরিপূর্ণ গুণ পাওয়া যায় এবং তার সত্তা সকল ধরণের ত্রুটি-ঘাটতি থেকে পবিত্র এবং তাঁর ফেরেশতা, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণ সত্যসহ প্রেরিত; কিয়ামতের দিবস সত্য, মহান আল্লাহ সকল বস্তুর ভাল মন্দ প্রথম থেকেই নির্ধারণ করেছেন।

**ঈমানে মুফাস্সাল হলঃ** আল্লাহ বিদ্যমান, তিনি কদিম, সবসময় বাকী থাকবেন তাঁর সত্তার সাথে কোন সৃষ্টির সাদৃশ্য নেই। তিনি একক তাঁর জীবন; জ্ঞান, শক্তি, ইচ্ছা, শ্রবণ, দেখা, কথা বলা সবই রয়েছে; তাই তাকে জীবন্ত, জ্ঞানী, ক্ষমতাধর, ইচ্ছা পোষণকারী, শ্রবণকারী, দ্রষ্টা ও কথক বলা হয়।

নবীগণ তাদের কারো কারো আলোচনা কোরআনে, তাওরাতে, ইঞ্জিলে, যাবুরে ও অন্যান্য নবীদের সহিফায় এসেছে; কিন্তু নবীদের সঠিক সংখ্যা মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে জানায়নি। তাই যাঁরা আমাদের কাছে পরিচিত ও যারা আমাদের কাছে পরিচিত নন আমরা সকলের প্রতি

---

[২১]. লুগাতুল কোরআন, রূহুল মা'আনী।

ঈমান আনব, তাদের কিতাবসমূহ ও সকল ফেরেশতাদের প্রতিও বিস্তারিতভাবে ঈমান আনব।

আসল ঈমান বা বাস্তব ঈমানের ব্যাখ্যা আল্লামা মুহাদ্দিছ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) তাঁর কিতাবে বলেন, ঈমান হল, আল্লাহর নবীর উপর তাঁর আনিত সকল বিধান মেনে নিয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা।

তাই যদি কোন ব্যক্তি মুহাম্মদী শরীয়তের উপর পরিপূর্ণভাবে প্রত্যেক অংশের উপর ঈমান আনে; কিন্তু তার বিশ্বাস তার তদন্তভিত্তিক; রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কারণে নয়, তখন সে কাফির হবে।[২২]

এই ব্যাখ্যায় ঐ সকল লোকের খেয়াল করা উচিত যারা শুধুমাত্র ভাল কাজের কারণে কাউকে মু'মিন বলে থাকেন।[২৩]

ইমাম রাগেব ইস্পাহানি বলেন, যদি ঈমান শব্দ সকর্মক হয় তখন তার অর্থ হবে, কাউকে নিরাপত্তা দেওয়া; সে হিসাবে মহান আল্লাহকে গুণগত নামে মু'মিন বলা হয়। আর যদি অকর্মক **(لازم)** হয় তখন অর্থ হবে নিরাপত্তার মালিক হওয়া।

অধিকাংশ সময় কোন নফস বিশ্বাসের সাথে হকের অনুসারী হওয়া বুঝায় এবং বিশ্বাস তিন বস্তুর সমন্বয়ের নাম: অন্তরের বিশ্বাস, মুখে স্বীকার, সে মতে আমল বা কাজে পরিণত করা।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

**﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ﴾**

---

[২২]. ফয়যুল বারী, খ-১।

[২৩]. কামুসুল কোরআন: পৃষ্ঠা-১৫৬।

**অর্থ:** যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি; তারা সিদ্দিক। এখানে পরিপূর্ণ ঈমানদার বুঝানো হয়েছে।[২৪]

উল্লেখিত প্রত্যেক বস্তুর উপর পৃথকভাবেও ঈমান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾

**অর্থ:** মহান আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে বরবাদ করবেন না।[২৫]

এখানে ঈমান দ্বারা নামায বুঝানো হয়েছে এবং হাদিছ শরীফে এসেছে লজ্জা ও কষ্ট দায়ক বস্তু সরানোকে এ অর্থেই ঈমান বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণী:

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾

**অর্থ:** হে পিতা! আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী, এখানে বিশ্বাস ও ইয়াকিন উদ্দেশ্য।[২৬]

পবিত্র কোরআনে কাফিরদের সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে,

﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾

**অর্থ:** তারা ঈমান এনেছে মূর্তির উপর ও শয়তানদের উপর।[২৭] এখানে ঈমান শব্দ ভর্ৎসনা ও অপবাদ হিসাবে বলা হয়েছে।

**রাসূল ﷺ ঈমানের মূল ছয়টি বস্তুকে বলেছেন,**

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ২. তাঁর কিতাবের প্রতি ঈমান আনা ৩. তার ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা ৪. তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনা ৫. কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনা ৬. তাক্বদিরের প্রতি বিশ্বাস করা।[২৮]

---

[২৪]. সূরা হাদিদ:১৯।
[২৫]. সূরা বাক্বারা:১৪৩।
[২৬]. সূরা ইউসুফ: ১৭
[২৭]. সূরা নিসা:৫১।

শরয়ী ঈমান কি? তাতে আলিমদের মতানৈক্য রয়েছে। জমহুর মুহাদ্দিসিন বলেন,

**الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان**

ঈমান হল অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমল করার নাম।

মাতুরিদিয়া ও আশায়েরা সম্প্রদায়ের একটি বড় দলের মত হল ঈমান শুধুমাত্র অন্তরের বিশ্বাসের নাম; মুখে স্বীকার দুনিয়াবী বিধানের জন্য শর্ত। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন, বাস্তব ঈমান তো অন্তরের বিশ্বাসের নাম। তবে পরিপূর্ণ ঈমান হল যাতে বিশ্বাস, স্বীকার ও আমল পাওয়া যায়।

মূল ঈমানে জাহান্নামে স্থায়ী থাকা থেকে মুক্তি দেবে এবং পরিপূর্ণ ঈমান জাহান্নামে প্রবেশ থেকে হেফাজত করবে। তাই হাদিছে **أن تؤمن بالله و ملائكته** ঈমানের সংজ্ঞা দ্বারা মুল ঈমান উদ্দেশ্য আর **الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و أقام الصلوة** দ্বারা দ্বিতীয় প্রকার উদ্দেশ্য।

এ আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, মত্যনৈক্যটি আসলে বাহ্যিক; কেননা ইমাম শাফেয়ী ও মুহাদ্দিসিন আমলকে ঈমানের অংশ বলা দ্বিতীয় অর্থ হিসাবে। কেননা তারাও আমল ছাড়া ঈমানের প্রথম স্তর স্বীকার করেন এবং দ্বিতীয় দল যারা মুখে স্বীকার ও আমলকে অন্তর্ভুক্ত করেনি তা প্রথম স্তর হিসাবে বলেছেন। নতুবা তারাও আমলকে দ্বিতীয় অর্থ হিসাবে অংশ মনে করেন।[২৯]

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানীর ব্যাখ্যা দ্বারা মুহাক্কিকিনের সমর্থন পাওয়া যায়।

**جنس (জাতিগত) ও نوع (ধরণগত) দৃষ্টিকোণে ঈমান ছয় প্রকার:**

---

[২৮]. হাদিছে জিব্রাইল।

[২৯]. তাফসিরে আইনী:১/১২২।

১. **إيمان مطبوع** স্বভাবজাত ঈমান হল তা ফেরেশতাদের ঈমান
২. **إيمان معصوم** নিষ্পাপ ঈমান হল তা নবীদের ঈমান।
৩. **إيمان محفوظ** সুরক্ষিত ঈমান হল তা সিদ্দিক, সালেহ, সাহাবা, তাবেঈন ও তবে-তাবেঈনদের ঈমান।
৪. **إيمان مقبول** কবুলকৃত ঈমান। তা হল নিষ্ঠাবানদের ঈমান
৫. **إيمان موقوف** স্থগিত ঈমান। তা হল কাফের-মুশরিকদের ঈমান।
৬. **إيمان مردود** প্রত্যাখান ঈমান তা হল মুনাফিকদের ঈমান।[৩০] আল্লাহই ভাল জানেন।

জমহুরে আহলে সুন্নাত তথা আশায়েরা ও মাতুরিদিয়ার নিকট আমল ঈমানের অংশও নয় রুকন ও শর্তও নয়। ঈমান ভিন্ন বস্তু ও আমল ভিন্ন বস্তু। তাই মহান আল্লাহ ঈমানের সাথে নেকআমলের কথা বলেছেন।

তাই সূরা ক্বাহাফে এসেছে,

**﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾**

**অর্থ:** নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউসে আতিথেয়তার ব্যবস্থা করা হবে।[৩১] এখানে ঈমানকে নেক আমলের সাথে যিকর করা হয়েছে।

**﴿ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾**

**অর্থ:** যদি মু'মিনদের দু'টি দল মারামারি করে।[৩২]

**﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾**

---

[৩০]. ইসলামী মালুমাত কা মাখযান: ১২৭।
[৩১]. সূরা ক্বাহাফ: ১০৭।
[৩২]. সূরা হুজরাত: ৯।

**অর্থঃ** যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানে কোন অন্যায় মিশ্রিত করেনি।[৩৩]

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا﴾

অর্থঃ যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি।[৩৪]

এ তিন আয়াতে ঈমানকে পাপের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে কিতালের সাথে দ্বিতীয় আয়াতে অন্যায়ের সাথে তৃতীয় আয়াতে হিজরত না করার সাথে। অথচ কোন বস্তুকে তার বিপরীতে বা তার অংশের বিপরীত বস্তুর সাথে একত্রিত করা যায় না। তাতে বুঝা গেল ঈমান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজের নাম নয় এবং ভাল কাজ তার অংশ নয় এবং খারাপ আমল ঈমানকে ধ্বংস করতে পারে না। কেননা ঈমান কূফরির বিপরীত এবং ভাল কাজ পাপের বিপরীত।

তাই যদি আমলকে ঈমানের অংশ মানা হয় তখন পাপকে কূফরের অংশ মানতে হবে অথচ সকলে একমত যে, ইবাদত ও অনুগত না করার কারণে কেউ কাফির হয় না। এতে বুঝা গেল আমল ঈমানের অংশ নয়।

জমহুরে মুতাজেলা ফের্কা ও খারেজীদের মাযহাব হল আমলও ঈমানের অংশ ও রুকন এবং প্রসিদ্ধ হল, সকল মালেকী, হাম্বালী ও শাফেয়ী মুহাদ্দিসিনের মাযাহাবও তাই। অথচ তাদের এবং মুতাজেলা খারেজীদের মাঝে বিরাট ব্যবধান রয়েছে।

মুতাজেলাদের নিকট যারা নেক আমল ছেড়ে দেয় তারা মু'মিন থাকেনা। কেননা তাদের নিকট আমল ঈমানের অংশ এবং আবার তারা আমল তরককারীকে কাফিরও বলেন না, মুমিনও বলেন না, মাঝখানে অবস্থান করেন কিন্তু খারেজীরা তাদেরকে কাফির বলে।

কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কেরাম তাদেরকে ঈমানের গন্ডি থেকে বের করে দেননি। কেননা তাদের নিকট আমল পরিপূর্ণ ঈমানের জন্য শর্ত কিন্তু কিছু লোক বলেন, যে, মুহাদ্দিসিনের নিকট বিশ্বাস, স্বীকার ও আমল ঈমানের অংশ

---

[৩৩]. সূরা আন'আমঃ ৮২।

[৩৪]. সূরা আনফালঃ৭২।

তা সঠিক নয় তা তাদের খেয়ালী মাযহাব। তা জমহুরে আহলে সুন্নাতের বিপরীত। তা মুতাজিলা ও খারেজিদের মাযহাব। অথচ এই খেয়াল ভুল। কেননা কোনভাবে মুহাদ্দেসীনের নিকট আমলকে মৌলিক ঈমানের অংশ বলা যাবেনা; বরং তাকে পরিপূর্ণ ঈমানের অংশ বলা যাবে এবং যার বিশ্বাস ও স্বীকার আছে আমল নেই সে যদিও মু'মিন কিন্তু দুর্বল ঈমানদার। তাদের ফাসিক মু'মিন বলা যায়।[৩৫]

[৩৫]. মাযাহেবুল ইসলাম: ৫২২।

.....

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

**﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾**

**অনুবাদঃ** আর ঐ প্রাচীরটি ছিল নগরীর দুই ইয়াতিম কিশোরের, এর নিম্ন দেশে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।[৩৬]

**তাফসীরঃ** এই ঘটনাটি হযরত মূসা ও হযরত খিযির (আ) এর। বনী ইসরাইলের সে দুই ইয়াতিমের পিতা একজন আল্লাহর কামেল ওলী ছিলেন। যিনি এ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এবং সে তার সন্তানের জন্য কিছু সম্পদ দেওয়ালের নিচে রেখেছিলেন। যদি দেওয়ালটি ভেঙ্গে যায় তার সন্তানদের ক্ষতি হবে। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় ভাল লোকের কাজের ফলাফল তার সন্তানরাও ভোগ করে। তাই নবী করীম ﷺ এর বরকত তাঁর বংশধররা অবশ্যই লাভ করবেন।

ইমাম যাইনুল আবেদীন এ আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে বলেন,

**وأَمَّا الجدار الآية: أنه كان بينهما و بين الذى حفظ فيه سبعة آباء، فلا ريب فى حفظ ذريته صلي الله عليه وسلم و أهل بيته فيه و إن كثرت الوسائط بينهم و بينه .**

**অর্থঃ** যে দুই ছেলের দেওয়ালকে হেফাযত করা হয়েছে তারা এবং সেই ভাল লোকের মাঝখানে সাত তবকা (স্তর) দূরত্ব ছিল। এ থেকে বুঝা যায় নবী করীম ﷺ ও তাঁর পরিবারের অধিকারকে হেফাযত জরুরি করা। যদিও বংশপরম্পরার দূরত্ব বেশী হয়ে যায়।

ইমাম জাফর সাদেক বলেন,

---

[৩৬]. কাহফ:৮২।

.....

**احفظوا فينا ما حفظ العبد الصالح فى اليتيمين و كان ابُوهما صالحا (رواه الحافظ عبد العزيز)**

**অর্থ:** আমাদের কারণে আমাদের সন্তানদের হক তোমরা হেফাযত কর; যেমন মহান আল্লাহ দুই ইয়াতিমের হক হেফাযত করেছেন একজন নেক লোকের কারণে।

**أهل العباء** দ্বারা উদ্দেশ্য পাঁচ ব্যক্তি যাদেরকে নবী পরিবার বলা হয়।

**آل العباء رسول الله و ابنته: و المرتضى ثم سبطاه اذا اجتمعوا**

অর্থাৎ, **آل العباء** দ্বারা ১. রাসূল ﷺ ২. তার কন্যা ফাতেমা যাহরা (র) ৩. হযরত আলী (র) ৪. হযরত হাসান (র) ৫. হযরত হুসাইন (র)। যখন তাঁরা সকলে একত্রিত হন।

গোলামের উপরও আহলে বাইত ব্যবহৃত হয়। যখন আহলে বাইত শব্দ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় তখন তা দ্বারা বনী হাশিম উদ্দেশ্য নেওয়া হয়। নবী করীম ﷺ বলেন, **سلمان منا أهل البيت** (সালমান আমাদের আহলে বাইত)। অর্থাৎ, তিনি তাঁর বংশের আযাদকৃত গোলামের ক্ষেত্রে **أهل بيت** শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৩৭]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, **آل محمد كل تقى نقى** আলে মুহাম্মদ হল ঐ সকল লোক, যাঁরা মুত্তাকী ও পুতঃপবিত্র বা নেককার। নবী করীম ﷺ এর বংশধর ক্বিয়ামতের ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকবেন। তাঁদের বংশ অনেক বড় হবে। তারা একত্রে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। অন্য ইসলামী সকলজাতি একত্রে পথভ্রষ্ট হতে পারে। সাইয়্যেদের বংশপরম্পরা ইব্রাহিম আলাইহিস

[৩৭]. ফয়যে উওয়াইসী পৃ: ১২ পারা: ১২।

সালামের সাথে মিলিত। যা উত্তম বংশ ও ইব্রাহীম (আ)এর খান্দানের এ দু'আর ফসল। তিনি দু'আ করে বলেছেন,

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾

**অর্থঃ** হে আল্লাহ! আমার বংশ থেকে একটি মুসলিম জাতি সৃষ্টি করুন।[৩৮]

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾

**অর্থঃ** (আর) যাঁরা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানেরা ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সাথে তাঁদের সন্তানকে মিলিয়ে দিই এবং তাঁদের আমলে কোন কম দেওয়া হবে না।[৩৯]

খাযাইনুল 'ইরফানে এসেছে, জান্নাতে যদিও বাপ-দাদার মর্যাদা উচুঁতে হয় তখনও তাদের খুশির জন্য তাদের সন্তানকে তাদের সাথে মিলীয়ে দেওয়া হবে এবং মহান আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাঁদের মর্যাদাও বৃদ্ধি করে দেবেন।

জালালাইন শরিফের টীকায় এসেছে,

فيكونون فى درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم تكرمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم

আল্লাহর ওলীদের সন্তানরা যদি তাদের পিতা-মাতার মত আমল করেনি, তখনও বাপ-দাদার সম্মানার্থে জান্নাতে তাদের সাথে স্থান দেওয়া হবে।[৪০]

তাফসীরে ইবনে কাসীরে এসেছে,

---

[৩৮]. সূরা বাক্বারা: ১২৮।

[৩৯]. কানযুল ঈমান, সূরা তূর: ২১।

[৪০]. জালালাইন: ৪৩৫, মাদারেক: ১৯১।

لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم فى منازلهم

**অর্থ:** আল্লাহ সন্তানদেরকে সে মর্যাদা দান করবেন যাতে তারা নিজের সন্তানের সে মর্যাদা দেখে চক্ষু শীতল করেন।

পবিত্র হাদিছ শরীফে এসেছে:

**عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ سَأَلَ عَنْ أَبَوَيْهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ , فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا دَرَجَتَكَ وَعَمَلَكَ , فَيَقُولُ: يَا رَبِّ , قَدْ عَمِلْتُ لِي وَلَهُمْ , فَيُؤْمَرُ بِالْحَاقِهِمْ " , وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ} [الطور: ٢١] الْآيَةَ**

**অর্থ:** রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যখন আল্লাহর নেক বান্দাহ জান্নাতে প্রবেশ করবে; তখন নিজের উচুঁ স্থানে মাতা-পিতা, বিবি সন্তানদেরকে না পেয়ে জিজ্ঞেস করবে তারা কোথায়? উত্তর আসবে তাদের আমল আপনার থেকে নিচে তাই তারা আপনার স্থানে আসতে পারেনি। সে বান্দাহ বলবে, হে আল্লাহ! আমি যে সকল ভাল কাজ করেছি তা শুধু আমার জন্য করেনি; বরং মাতা-পিতা বিবি বাচ্চাদের জন্যও করেছি তখন আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকেও তার স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে।

এ হাদিছ বর্ণনা করার পর হযরত ইবনে আব্বাস (র) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

**وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ**[41]

এ থেকে বুঝা যায়, জান্নাতীরা নিজের সন্তানসহ জান্নাতে থাকবেন। তেমনি যদি কোন মাতা-পিতার স্তর নিচে হয় এবং সন্তানের স্তর উপরে হয় তখন

[৪১]. মুজামে সগির, তাবরানী, ১/৩৮২, তাফসিরে ইবনে কসির: ২/২৪৬।

পিতাকে উন্নীত করা হবে সন্তানের অবস্থা বরাবর তেমনি পিতার কারণে সন্তানের উন্নতি হবে। তবে শর্ত হল ঈমানদার হতে হবে; কাফির ফাসিক মুরতাদ হলে এ পদোন্নতি হবে না।

এ সকল বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, মহান আল্লাহ স্বীয় পবিত্র ওলী-বুযুর্গকে খুশি করার জন্য তাঁদের সন্তানকে তাঁদের মর্যাদা দান করবেন সে সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য আমাদের উচিত ওলীদের সন্তানের আদব রক্ষা করা, সম্মান করা তাদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা, যে দৃষ্টিতে তাদের বাবাকে দেখা হত; কেননা বুযুর্গদের আমল তাদের সন্তানের কাজে আসে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিক অবগত।

.............................................................................................

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

**﴿ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ (طه:৬৩) ﴾**

**অর্থ: إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ** এ কথা ভাষার দৃষ্টিকোণে বলা হয়েছে। ই'রাব বা স্বরচিহ্নের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। আর বলা হয় ফেরাউন তাদেরকে বলল, নিশ্চয়ই তাঁরা দুজন মুসা ও হারুন জাদুকর (আ)।[৪২]

**তাফসির:** ইবনে আব্বাসের তাফসিরে এসেছে, তা বনী হারেছ ইবনে কাবের ভাষা মতে।

তিনি বলেন,

**و إنما قال إِنَّ هذان لساحران على اللغة لا على الإعراب و يقال قال لهم فرعون إن هذا موسى و هارون عليهما السلام (ص:১৯৬)**

এখানে **هذان** শব্দটি এই ভাষা মতে যারা দ্বিবচন ও বহুবচনের জন্য আলিফ ব্যবহার করে।[৪৩]

তাফসিরে মাযহারিতে এসেছে, **إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ** এটি আল্লামা ইবনে কাসীর ও হাফসের ক্বিরাআত মতে **إن** শব্দের নূন অক্ষরটি সাকিনের সাথে পাঠ করা হবে। তখন সে সাকিনযুক্ত নুনটি তাশদীদ যুক্ত নূনের হতে উচ্চারণে সহজ করার জন্য সাকিন যুক্ত করা হয়েছে। মূলত **إِنَّ** হল হরফে মুশাব্বাহ বিল ফি'ল।

সেখানে এর খবরে যে লামটি এসেছে তা পার্থক্য করার জন্য এসেছে অথবা তা নাবোধক তখন **لام** এর অর্থ **إلا** হবে। অর্থাৎ **مَا هَذَانِ إِلاَّ سَاحِرَانِ**

---

[৪২]. তাফসীরে ইবনে আব্বাস: পৃ. ১৯২

[৪৩]. তাজুত তাফাসির: ২:১১।

আর আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ) **هذَانِّ** শব্দের **نون** অক্ষরকে তাশদীদের সাথে পাঠ করেছেন। অন্যান্যরাও নূন অক্ষরকে তাশদীদযুক্ত তেলাওয়াত করেছেন। আবু 'উমরের মতে এ শব্দটি মূলে **هذيْنِ** (হাজাইনে) ছিল। আর অন্যান্যদের মতে **هذان** শব্দটি মূলে আলিফ যোগে এ অবস্থায়ই ছিল।

তার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হিশাম ইবনে ওরওয়া তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি হযরত আয়েশা থেকে বর্ণনা করেন, তা লেখকের ভুল; এ মতটি ইজমার বিপরীত। আর কেউ বলেন, তা বনী হারেছ, খাছআম ও কেনানার ভাষা মতে কেননা তারা দ্বিবচনের পেশ, যবর ও যের হরকতের জন্য প্রত্যেক অবস্থায় আলিফ ব্যবহার করে।

তারা আলিফকে দ্বিবচনের আলামত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং **مثنى** (দ্বিবচন) কে তারা উহ্য **إعراب** (স্বরচিহ্ন) দ্বারা ইরাব প্রদান করে থাকেন।

যেমন তারা বলেন,

**أتانى الزيدان، رأيت الزيدان، مررت بالزيدان،**

তেমনি তারা এ নিয়ম ব্যবহার করে দ্বিবচনের ক্ষেত্রে ইয়া সাকিনের স্থলে 'আলিফ' ব্যবহার করে যার পূর্ববর্তী বর্ণ যবর বিশিষ্ট হয়। যেমন: **كسرت يداه و ركبت علاه** মূলত **يداه** ছিল **يديه** ও **علاه** ছিল **عليه** ।

তেমনিভাবে আসমায়ে সিত্তা মুকাব্বারাহ এর ক্ষেত্রে হয় যখন 'ইয়া' ব্যতীত অন্য কারো দিকে সম্বন্ধিত হয়। যেমন কবি বলেছেন:

**إنَّ إبّاها و أبا إبّاها: قد بلغا فى المجد غايتاها**

* কেউ কেউ বলেন: **إنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ** বাক্যে **إن** এর ইসিম হল উহ্য জমিরে শান (সম্মানসূচক সর্বনাম) আর **هَذَانِ لَسَاحِرَانِ** হল **إنَّ** এর **خبر** (খবর)। মূলে বাক্যটি ছিল: **إنّهُ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ** ।

* কারো কারো মতে, উক্ত বাক্যে **إنَّ** (ইন্না) অর্থ হল **نَعَمْ** (হ্যাঁ) এর পর যা আছে তা মুবতাদা ও খবর। বর্ণিত আছে যে, এক আরব বেদুঈন আব্দুল্লাহ বিন যোবাইর (রা) এর কাছে কিছু চাইলে তিনি তাকে কিছু না দিয়েই বিদায় করলেন। তখন এ ভিক্ষুক বলল: **لعن الله ناقةً حَمَلَتْنِيْ إِلَيْكَ** (আল্লাহর অভিশাপ সে উটনীর উপর, যে আমাকে তোমার কাছে বহন করে নিয়ে এসেছে)। এ বাক্য শোনে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবাইর (রা) বললেন, **إنَّ وصاحبها أي نعم** এখানে **إنَّ** অর্থ **نعم** হ্যাঁ।

* ইমাম বায়যাভী (রহ) বলেন: এখানে লাম নিশ্চয়ই মুবতাদার খবরের পূর্বে বসে না।

* অনেকেরই মতে, মূলে তা ছিল: **إنْ هَذَانِ لهما سَاحِرَانِ** অথবা **إنَّ يَعْنِىْ نَعَمْ هَذَانِ لَهُمَا سَاحِرَانِ** সুতরাং জমিরে শানকে এবং হুমা (**هُمَا**) জমিরকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। আর তথায় **أَنَّ المؤكّد باللام** (নিশ্চয়তা বোধক **أَنَّ** লাম দ্বারা) এর জন্য জমিরকে বিলুপ্ত করা যৌক্তিক নয়।[৪৪]

**মোটকথা:** আল্লাহর বাণী: **إنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ** এ আয়াতের ইরাবে সাধারণ নীতির বিপরীত হওয়ার কারণে মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেননা সাধারণত এখানে **هذين** হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাই তার সমাধান বের করতে গিয়ে মুফাসসিরগণ ছয়টি ক্বেরাত ও সমাধান বের করেছেন:

১. এখানে **إنَّ** শব্দটির নোনে তাশদিদের সাথে হবে এবং **هذين** হবে ইয়ার সাথে। এটি হাসান বসরী ও নখয়ী ও সাহাবাদের একদল তথা হযরত ওসমান (রা) হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত। এটি আবু আমরেরও ক্বেরাত। তখন নাহুশাস্ত্রের নিয়ম মতে হয়। যদিও তা মাসহাফে ওসমানির লিখন পদ্ধতির বিপরীত। কেননা সেখানে আলিফের সাথে এসেছে তথা **هذان** এসেছে। ইয়া তথা **هذين** আসেনি।

[৪৪]. তাফসীরে বায়যাভী, পৃ. ১৪৯, সূরা ত্বোহা, পারা-১৬, খ-৬।

কেউ বলেন, মাসহাফে আলিফ ও ইয়া একটিও নেই। সামীন বলেছেন এখানে শব্দটি **هذان** হবে এবং বলেন, লিখন পদ্ধতিতে এমন অনেক কিছু আছে যা ক্বিয়াছী, নিয়মনীতি বহির্ভূত। মুহাক্কিকীনের ইজমা হল সাহাবায়ে কেরামের লিখন পদ্ধতির বিপরীত বৈধ নয়; তাই সেখানে যেভাবে এসেছে সেভাবে লিখতে হবে, এর বিপরীত লেখা যাবে না। যেমন- **الصلوة، الزكوة** এখানে **واو** এর সাথে লিখা হবে। অথচ নীতি হল 'ওয়াও' এর স্থলে 'আলিফ' হওয়া। তাই কোরআন ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে আমরা **زكاة** ও **صلاة** শব্দ দুটি আলিফ দিয়ে লিখি। ইমাম রাযী এটাই বলেছেন। যেমন কোরআন মজিদে এসেছে:

﴿وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾

এখানে 'লামে তাকিদ' ও 'ইলা' এক সাথে মিলিয়ে পড়া হয়। অথচ মাঝখানে আলিফ রয়েছে যা পড়া হয় না।

**২. দ্বিতীয় পঠন পদ্ধতি:**

**إِنَّ** এতে নূনে তাশদীদ যুক্ত হবে এবং **هذان** শব্দে আলিফ হবে। তা মদীনাবাসী ও কূফাবাসীর ক্বিরাত। এ ক্বেরাতটি আবু আমর, ইবনে কাসীর ও হাফস ব্যতীত সকলের এবং আরবের অনেক গোত্রের রীতি মতে। আবু হায়্যান (রা.) লিখেন, এটি বনী হারেছ ইবনে কাব, খাছআম, জুবাইদা, বনু নদ্বীর, বনু জুহাইম, বনু মুরাদ ও বনু আযরার ভাষা মতে।

যেমন কবি বলেন:

تزوّد منى بين أذناه ضَرَبْتُه

**অর্থ:** সে তার দু' কানের মাঝখানে একটি আঘাত আমার নিকট হতে পাথেয় হিসাবে নিয়ে গেল।

তারা তাদের ভাষায় দ্বিবচনে সবসময় আলিফ ব্যবহার করেন। নাহু শাস্ত্রের ইমাম আল্লামা সীবওয়াই, আখফাশ, আবূ যায়েদ, কাসাঈ, ফররা তাদের সে রীতির কথা তুলে ধরেছেন। যেমন তাদের আরেক কবি বলেছেন,

**إنَّ اباها و أبا إباها: قد بلغا فى المجد غايتاها**

**অর্থ:** তার পিতা ও দাদা মর্যাদায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছেন। এখানে **غايتيها** এর স্থলে **غايتاها** বলা হয়েছে।

শায়খ ইবনে কাসীর বলেন, এ ভাষাটি কিছু আরব লোকের আর এ ক্বিরাত তাদের ভাষার ই'রাব মতে আসে।

**৩. তৃতীয় ক্বিরাত:**

পূর্ববর্তী নাহুবিদরা বলেছেন মূলত বাক্য ছিল **إنَّه هذان لساحران** তাই এখানে একটি যমীরে শান উহ্য রয়েছে, বাকি বাক্যটি উদ্দেশ্য ও বিধেয় মিলে **إنَّ** এর বিধেয় হবে।

**৪. চতুর্থ মত হল:**

কিছু আলিমগণ বলেছেন, **إنَّ** এখানে **نَعَمْ** হ্যাঁ এর অর্থে। বাকী বাক্যটি উদ্দেশ্য ও বিধেয় মিলে খবর। অর্থ হবে হ্যাঁ এ দু'জন যাদুকর। আল্লামা বায়যাবী শেষোক্ত দু'টি বর্ণনায় প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, উদ্দেশ্য ও বিধেয়তে **لام** আসে না। হিশাম ইবনে ওরওয়া তার পিতা থেকে, তিনি হযরত আয়েশা থেকে বর্ণনা করেন, তা লেখকের ভুল। এ কথাটি ইজমার বিপরীত। তাই ইজমার বিপরীত দলিল হতে পারে না।

**৫. পঞ্চম ক্বিরাত:**

এখানে মূল বাক্য হল: **إنَّه هذان لهما ساحران** তখন বিধেয়েতে কিভাবে **لام**আসল তা প্রশ্ন করা যাবে না; কিন্তু ইমাম বায়যাভী তাতে প্রশ্ন করেছেন **لام**দ্বারা যে সকল শব্দ গুরুত্বারূপ করা হয় তা উহ্য হয় না; তাই

তিনি আবু আমরের ক্বিরাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ **إِنَّ هذين لساحران**

**৬. ষষ্ঠ ক্বিরাত:**

ইবনে কাসীর ও হাফসের। তারা **إن** এর নূনকে সাকিনের সাথে পড়েন এবং **هذان** আলিফ দিয়ে পড়েন। আল্লামা বায়যাবী এ দু'টি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন: প্রথমত: তা **إن** মুশাদ্দাদ থেকে তাখফীফ করা হয়েছে। তা আবু আমরের ক্বিরাত। কেননা **إن** তাখফীফ আমল করে না তখন তার বিধেয়তে **لام** আসাটা **إن** নাফিয়া থেকে পার্থক্য করার জন্য।

**দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল:** এখানে **إن** না বোধক নেওয়া হবে। তখন **لام** এর অর্থ **الا** হবে। এটি বিশুদ্ধ। অর্থাৎ **إِنْ هَذَانِ اِلاَّ - إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ سَاحِرَانِ**

**মোটকথা:** এখানে মৌলিকভাবে তিন ক্বিরাত: একটি আবু আমেরের। তখন **إِنَّ** এর নোনে তাশদীদ হবে এবং **هذين** হবে। অর্থাৎ **إِنْ هَذَاين لَسَاحِرَانِ** দ্বিতীয় হাফস ও ইবনে কাসীরের ক্বিরাত। তখন **إن** এর নোনে তাখফীফ হবে। তৃতীয় ক্বেরাত বাকী সকলের। তখন **إِنَّ** নোনে তাশদীদ হবে এবং **هذان** আলিফ দ্বারা হবে। আয়াতের বিশুদ্ধ অর্থ হল: যাদুকররা পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, তারা দু'জনই যাদুকর।[৪৫]

[৪৫]. তাফসিরে মাওয়াহেব: ২৫৭, পারা: ১৬, সূরা ত্বোহা।

.....

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

# ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

**অনুবাদঃ** ১. হে প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি আপনার অসিলায় আমি সারা জাহানে রহমত প্রেরণ করব।

২. হে প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাকে বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।[৪৬]

হযরত বুলবুল সিরাজ সাদী বলেন,

| | | |
|---|---|---|
| يا صَاحِبَ الجَمَالِ وَ يَا سَيِّدَ البَشَرِ | # | مِنْ وَجْهِكَ المُنِيْر لَقَدْ نُوِّرَ القمرُ |
| لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقَّه | # | بعد از خدا بزرك توئ قصه مختصر |

**অর্থঃ** হে পূর্ণ সৌন্দর্যের অধিকারী, হে মানবকুলের সরদার, আপনার উজ্জ্বল চেহারা দ্বারা চন্দ্র আলোকিত হয়েছে। আপনার যথাযথ প্রশংসা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, সংক্ষেপে বলা যায়, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পরেই আপনার বুজুর্গী।

**مولای صلّ وسلّم دائما أبدا # على حبيبك خير الخلق كلهم**

**অর্থঃ** হে মওলা! সৃষ্টির সেরা আপনার প্রিয় হাবীবের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

হযরত মাওলানা আলহাজ্ব আব্দুল মোস্তাফা 'আযমী তাঁর এক বয়ানে মুফাসসিরীনে কেরামের বরাত দিয়ে বলেন, এখানে তারকিব দু' ধরণের হতে পারেঃ

১. এখানে **رَحْمَةً للعلمين** শব্দটি **أَرْسَلْنَا** ফেল এর মাফউলে লাহু (**مفعول له**) হয়েছে।

২. বা এ শব্দটি **ك** সর্বনাম থেকে (**حال**) অবস্থা বর্ণনা করার জন্য এসেছে। প্রথম বর্ণনামতে অর্থ হবে, হে প্রিয় হাবীব (দ.)! আমি আপনাকে এ জন্য পাঠিয়েছি যে, আপনার মাধ্যমে সারা জগতকে রহমত প্রেরণ করব।

---

[৪৬]. সূরা আম্বিয়াঃ ১০৭।

অর্থাৎ, আপনি প্রত্যেক রহমতের কারণ। যমীন-আসমান সৃষ্টি, সমস্ত সৃষ্টি জগত আপনারই কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়া ও পরকালে সকল নিয়ামত সৃষ্টি করা, নবীগণকে উচুঁ মর্যাদা ও অলৌকিকতা (মুজিজা) দান, সকল আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করা, পরিপূর্ণ আউলিয়া কেরাম, শহীদগণ ও সালিহীনদেরকে উচুঁ মর্যাদা দান করা তা সবই আল্লাহর রহমত; কিন্তু সে সকল রহমতের কারণ মাহবুবে খোদা বহুগুণে গুণান্বিত সত্তার অধিকারী আপনি।

কোরআনে বিশ্বাসী ভাইয়েরা! এ হিকমতের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বিশ্বের সকল রহমত তার কারণে। কেননা তিনি সকল রহমতের কারণ তাকে বানিয়েছেন। যদি তিনি না হতেন যমীন সৃষ্টি হতনা, আসমান সৃষ্টি হতনা। এদিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন,

**﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾**

**অর্থ:** হে প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাকে পাঠালাম এজন্য যে, আপনার মাধ্যমে সারা জগতকে আমি রহমত প্রেরণ করি। এ থেকে বুঝা গেল আল্লাহর দরবার এর সকল রহমতের দরজা নবী করীম ﷺ।

প্রত্যেক নাহু পাঠকারী ছাত্ররা জানে কারণসূচক কর্ম (**فعل**) ও তার ক্রিয়ার (**معلل به**) কর্তা এক হয় এবং সেই কর্ম (**مفعول له**) ক্রিয়ার ( **فعل معلل به**) কারণ হয়। তাই এখানে **رحمة** শব্দটি পূর্ব (**مفعول له**) ক্রিয়ার কারণ হবে। তখন **أرسلنا** ও **رحمة** এর কর্তা এক তথা আল্লাহ হবে। তখন অর্থ দাঁড়ায় প্রিয় হাবিবকে মহান আল্লাহ পাঠালেন তাঁর কারণে তিনি জগতে রহমত প্রেরণ করবেন।

দ্বিতীয় মত হল, **رحمة للعلمين** শব্দটি **ك** থেকে অবস্থা (**حال**) বর্ণনা করবে। তখন এ তারকীবে আয়াতের অর্থ হবে হে প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্বের জন্য রহমত বানিয়ে। তখন **رحمة** শব্দটি ধাতু হলে ইসমে ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত হবে। তখন অর্থ হবে **رَاحِمًا** রহমকারী। যা **مبالغة** বা আধিক্যতা বাচক ধাতু হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তখন আয়াতের উদ্দিষ্ট্য অর্থ হবে, নবী

ﷺ সারা বিশ্বের উপর রহমকারী অর্থাৎ বিশ্ব হল মরহুম আর তিনি হলেন এর রহমতে ভূষিত। প্রত্যেক মরহুম তার রহমকারির দিকে মুখাপেক্ষী, তাই এ আয়াত দ্বারা একথা পরিষ্কার হয় যে, রাসূল ﷺ রহমকারী এবং সারা বিশ্ব তাঁর রহমত গ্রহণকারী। তাই এ থেকে বুঝা গেল, পুরো বিশ্ব তাঁর দিকে মুখাপেক্ষী এবং তিনি আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী। এ কথাকে জালালুদ্দীন রুমী (রহ) এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

زیں سبب فرمود حق صلوا علیه# کہ محمد بود محتاج الیہ

**অর্থঃ** মহান আল্লাহ সে কারণে সারা বিশ্ববাসীকে নবী ﷺ এর দরবারে সালাত ও সালাম পাঠানোর জন্য বলেছেন। কেননা পুরো বিশ্ব তাঁর (**مختار کل**) দিকে মুখাপেক্ষী।

এ কথা জেনে রাখা দরকার, কোরআনে করীমে রাসূলে করীম (দ.)কে সাধারণভাবে রহমত স্বরপ ঘোষণা করা হয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায় প্রত্যেক যুগে সমগ্র বিশ্ব তাঁর মুখাপেক্ষী। কোন রহমত গ্রহণকারী ততক্ষণ পর্যন্ত রহমত গ্রহণ করতে পারবে না, যতক্ষণ রহমতকারী বিদ্যমান থাকবে না। সমগ্র বিশ্ব তো এখনো বাকী এবং রহমত পাচ্ছে, তাতে প্রমাণিত হয় যে, এ বিশ্বের রহমতের কারণ নবী করীম ﷺ ও বিদ্যমান ও জীবিত আছেন। রওযা মুবারকে হায়াত নিয়ে তিনি বেঁচে আছেন।

হযরত শেখ সাদী (রহ.) বলেন,

یہ تو اصل وجود آمدی از نخست# وگرہرچہ موجود شد فرع تست.

**অর্থঃ** হে আল্লাহর রাসূল আপনি সৃষ্টির মূল হয়ে সবার পূর্বে এসেছেন এবং বাকী সকল সৃষ্টি আপনার শাখা প্রশাখা।

হযরত শেখ সাদী নবী করীম ﷺ কে পুরো বিশ্বের মূল বলেছেন এবং পুরো বিশ্বকে তার শাখা-প্রশাখা বলেছেন। তাই মূল পূর্বে আসতে হয় এবং শাখা পরে আসে তাই নূরে মুহাম্মদীকে সবার পূর্বে সৃষ্টি করেছেন। যেভাবে মূল থেকে শাখা বের হয় তেমনি নূরে মুহাম্মদী থেকে সারা বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। যদি কোন গাছের গোড়া কেটে যায়, তখন সকল শাখা প্রশাখা

মরে ধ্বংস হয়ে যায়। তাই যদি নবী করীম ﷺ মরে মাটি হয়ে যায় তাহলে পুরো বিশ্ব গোড়া না থাকার কারণে কিভাবে অবশিষ্ট থাকবে?
তাই বিশ্ব যখন শাখা স্বরূপ, তা বাকী থাকার জন্য তার শিকড় নবী করীম ﷺ কেও বাকী থাকতে হবে। এ থেকে বুঝা যায় শেখ সাদী (রহ)ও হায়াতুন্নবী স্বীকার করেন।

**প্রশ্নঃ** "রাহমাতুল-লিল-আলামিন" তো মহানবী ﷺ এর বৈশিষ্ট্য। তাই তা অন্য কারো জন্য কি ব্যবহার করা যাবে?
**উত্তরঃ** এটি রাসূল ﷺ এর খাস বৈশিষ্ট্য। এ আয়াতটি তাঁর মকামে মাদাহ বা প্রশংসার বর্ণনা দেওয়ার জন্য নাযিল করা হয়েছে। যা এ আয়াতের পূর্বাপর আয়াতের ইঙ্গিত দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, **رحمة للعلمين** তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাই তা অস্বীকার কারী কাফির। তাই অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা যাবেনা।
**দ্বিতীয় উত্তর হলঃ** যদি ব্যাখার আলোকে অন্য কারো জন্য জায়েয মনে করা হয়, তখন তা বিদআতে সায়্যিায়াহর অন্তর্ভুক্ত হবে, যা হারাম এবং তাহরীফ বা পরিবর্তনের নামান্তর।
**তৃতীয় উত্তরঃ** এ গুণ শুধুমাত্র রেসালাত পদের জন্য যোগ্য।

.....

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

## ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾

**অনুবাদঃ** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহবানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনই স্থির করো না যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।[৪৭]

কেননা, যাকে আল্লাহর রাসূল আহবান করেন, তার জন্য আহবানে সাড়া দেয়া ও নির্দেশ পালন করা অপরিহার্য (ওয়াজিব) হয়ে যায় এবং আদব সহকারে হাযির হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। আর নিকটে হাযির হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করবে এবং অনুমতি নিয়েই ফিরে যাবে।

অপর এক অর্থ তাফসীরকারকগণ এও বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহবান করলে যেন আদব ও সম্মান প্রদর্শন সহকারেই করে।

কিছুদিন পূর্বে একটি রেসালাহ আমার চোখের সামনে পড়ল সেখানে অনেক জোর দিয়ে 'ইয়া মুহাম্মদ' বলা প্রমাণ করেছে। তাই এ আয়াতের সঠিক অর্থ পাঠকদের সামনে তুলে ধরা উচিৎ মনে করি যাতে সাধারণ মানুষ ধোঁকায় না পড়ে।

**معناه ، لا تدعوه باسمه كمايدعو بعضكم بعضًا يا محمد يا عبد الله ولكن فخِّموه وعظِّموه وشرِّفوه وقولو يا نبى الله يا رسول الله فى لِين وتواضع .**

এর অর্থ হল, তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডেকো না যে রকম তোমরা একে অপরকে ডাক 'হে মুহাম্মদ'! ও 'হে আব্দুল্লাহ' বলে; বরং তাকে তোমরা

[৪৭]. সূরা নূরঃ ৬৩।

সম্মান কর, ইজ্জত দাও এবং নম্রভাবে বল 'হে আল্লাহর রাসূল!' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।[৪৮]

**لا تجعلوا تسميته وندءه بينكم كما يسمّى بعضكم بعضًا وينـاديه باسمه الذى سماه به ابواه فلا تقولوا يا محمد ولكن يا نبى الله يا رسول الله مع التوقير والتعظيم والصوت المخفوض .**

তোমরা তাঁর নাম নিওনা ডাকার সময়, যে রকম পরস্পরকে ডাক নাম নিয়ে যা তাঁর পিতা রেখেছেন। তাই তোমরা ইয়া মুহাম্মদ! বলনা বরং তোমরা হে আল্লাহর রাসূল! হে আল্লাহর নবী! বল, সম্মানের সাথে নিচুস্বরে।[৪৯]

**لا تجعلوا دعاء الرسول الخ – اي ندؤه بمعنى لاتنادوه باسمه فتقولوا يا محمد ولا بكنيّتهِ فتقولوا يا ابا القاسم بل نادوه وخاطبوه بالتعظيم والتكريم والتّوقيربان تقولوا يا رسول الله يا نبى الله يا إمام المرسلين يا رسول رب العالمين يا خاتم النبيين وغير ذالك واستفيد من الاية أنه لايجوز نداء النبى ﷺ بغير ما يفيد التعظيم لا فى حياته ولا بعد وفاته فبهذا يعلم ان من استخف بجنابه ﷺ فهو كافر ملعون فى الدنيا والاخرة .**

তোমরা তাকে তাঁর নাম নিয়ে ডাকনা 'ইয়া মুহাম্মদ!' বলনা এবং তাঁর উপনাম নিয়ে ডাকনা। তাই আবুল কাসেম বলবেনা; বরং তাকে সম্মানের সহিত ডাক এবং বল হে আল্লাহর রাসূল! হে আল্লাহর নবী! হে রাসুলদের ইমাম! হে রাব্বুল আলামীনের রাসূল! হে খাতিমুন নবীয়্যিন ইত্যাদি।

---

[৪৮]. খাযেন: ৩/৩৪২০।

[৪৯]. মা'আলিমুত তানযিল: ৩/৩৪২।

আয়াত দ্বারা বুঝা যায় নবী করীম ﷺ কে অসম্মানজনিত কোন শব্দ দিয়ে সম্বোধন করা যাবে না। তাঁর জীবদ্দশায় ও তাঁর বেছাল শরীফের পওে, তাই যে রাসূলের শানে বেআদবী করবে, সে কাফির, দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত।[৫০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীয় নাম তথা 'ইয়া মুহাম্মদ!' ও উপনাম তথা 'ইয়া আবাল ক্বাসেম!' বলে ডাকা যাবে না। বরং ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ! ইয়া ইমামাল মুরসালীন! ইয়া রাহমাতাল-লিল-আলামীন সহ অন্যান্য উপাধিযুক্ত নাম দ্বারা আহবান কর, যাতে সম্বোধনের ক্ষেত্রে তাঁর শান ও মান যথাযথভাবে অক্ষুণ্ন থাকে।

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যে সকল শব্দে নবী করীম ﷺ এর সম্মান নেই সে সকল শব্দ দিয়ে তাকে সম্বোধন করা যাবে না। তা তাঁর জীবদ্দশায় হোক বা বেছাল শরীফের পরে হোক এবং একথাও জানা যায় যে, যে সকল শব্দে তার অপমান রয়েছে যেমন জনাব বলা তা দিয়ে তাকে সম্বোধন করা কুফুরী। সে দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জাহানে অভিশপ্ত।[৫১]

**قال مجاهد والقتادة رضى الله عنهما معنى الآية ، لا تجعلوا دعاء كم الرسول كدعاء بعضكم بعضًا يعنى لاتدعوه باسمه كما تدعوا بعضكم بعضًا ولكن فخِّموه وشرِّفوه واخرج ابو نعيم فى الديلمى من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه قال كانوا يقولون يا محمد يا ابا القاسم فانزل الله تعالى هذه الآية فقالوا يا نبى الله يا رسول الله .**

মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রা) বলেন, এ আয়াতের অর্থ হল তোমরা তাঁকে নাম ধরে ডেকো না, যেভাবে একে অপরকে ডাক বরং তাকে সম্মানসূচক শব্দ দিয়ে সম্বোধন কর। আবূ নুআইম দায়লামীতে দাহহাকের সুত্রে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, মানুষেরা তাকে 'হে মুহাম্মদ!' 'হে আবুল

[৫০]. সাবী ৩: ১২৩।

[৫১]. হাশিয়ায়ে জালালাইন: ৩৫২।

কাসেম!' বলে সম্বোধন করত। যেভাবে তারা পরস্পর একে অপরকে ডাকত, তখন আল্লাহ তায়ালার এ আয়াত অবতীর্ণ হল। অর্থাৎ তোমরা এভাবে ডাকনা বরং 'হে আল্লাহর রাসূল! হে আল্লাহর নবী!' বলে সম্বোধন কর। এভাবে অন্য সকল বুযুর্গদের সাথেও আচরণ করা উচিত।[৫২]

## لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ الخ- بأن تقولوا يا محمّد بل قولوا يا نبى الله

তাফসীরে জালালাইনে এসেছে,

## يا رسول الله فى لين وتواضع وحفض صوت

অর্থাৎ তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাম ধরে ডাকবে না এর মর্মার্থ হল তোমরা ইয়া মুহাম্মদ! বলবে না। বরং বিনয়ের সাথে নম্রভাবে আদব কণ্ঠে বলো ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ![৫৩]

এ আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন,

## أي لا تدعوا الرسول باسمه يا محمد كدعاء بعضكم بعضًا باسمه ، ولكن عظّموه ووقّروه وشرّفوه وقولوا له يا نبى الله يا رسول الله .

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্যান্য মানুষের ন্যায়, 'ইয়া মুহাম্মদ! বলে ডেকো না। বরং অতি আদব, সম্মান-মর্যাদা ও বিনয়ের সাথে তাঁকে 'ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ! 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলে সম্বোধন করো।[৫৪]

---

[৫২]. তাফসিরে হক্কানী, ৫/২৫৪, তাফসিরে মাযহারী, ৬/৫৬৬।

[৫৩]. জালালাইন: ৩০২

[৫৪]. তাফসীরে ইবনে আব্বাস: ৫০৫।

তাই খেয়াল রাখতে হবে যে, নবী করীম ﷺ কে 'হে মুহাম্মদ!' বলে ডাকা নিষেধ ও হারাম।[৫৫]

এখানে আল্লাহর শিক্ষা হল, হে মুহাম্মদ! বলে তাকে সালাম দেওয়া যাবে না বরং হে আল্লাহর নবী! বলে সালাম দেওয়া যাবে। যেমন:

**السلام عليك أَيُّهَا النبى** এ থেকে বুঝা যায়, এ আয়াতের তাফসিরে ইবনে আব্বাসের তাফসীর সহ অন্যান্য মুফাস্‌সিরের তাফসীর বিশুদ্ধ।

এ আয়াতের তাফসীরে আরো অনেকে অনেক কিছু বলেছেন আগের পরের আয়াতের দিকে লক্ষ্য রেখে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইয়া মুহাম্মদ! বলার কথা বলেছেন তা প্রত্যেক তাফসিরের বিপরীত। তার সে ব্যাখ্যা কোন মুফাস্‌সিরের সাথে সম্পর্ক রাখে না, তাই তা মনগড়া তাফসির। আফসোস নবী করীম ﷺ তো বলে গেছেন:

**من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار (الحديث)**

**অর্থ:** যারা মনগড়া তাফসির করবে তাদের ঠিকানা নিজেই সে নির্ধারণ করল জাহান্নাম।

সে আল্লামা বলেছে, এ সকল গ্রহণযোগ্য তাফসিরে, হাদিছ ও ফুকাহাদের কথা দ্বারা দ্বিতীয় তাফসির বুঝা যায়, যা দুর্বল।[৫৬]

এখন কথা হল, প্রথম তাফসির কোনটি যদি বলা হয় হে মুহাম্মদ! বলা, তখন আমি বলব, আয়াতের প্রথম তাফসির যা তার নিকট সহিহ তখন বলবো, সে তাফসীর প্রথম নয় দশম হলে কোন তাফসীরে আছে তা দেখান। সেই আল্লামা মুকাদ্দামাতু রদ্দিল আযিম কিতাবের ১১-১৩ পৃষ্ঠায় 'ইয়া মুহাম্মদ' বলার স্বপক্ষে প্রায় ৩৮ টি দলীল পেশ করেছেন। মিশকাত শরীফ, জালালাইন শরিফ, তাফসিরে ফতহে আযিয, আতয়াবুল বয়ান ইত্যাদি তাফসির থেকে সেখানে সাতটির সম্বোধনকারী হলেন হযরত

[৫৫]. মিরআতুল মানাজিহ: ১/২৫।
[৫৬]. মুকাদ্দামাতু রদ্দিল আযিম পৃ:১৩।

জিব্রাইল (আ) আর একটির সম্বোধনকারী হলেন মালাকুল মাউত পাঁচটির সম্বোধনকারী হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রা), আর বাকী সবগুলোর সম্বোধনকারী স্বয়ং আল্লাহ।

যেমন মাওলানা বলেছেন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম বলেছেন, হে মুহাম্মদ আমাকে ইসলামের খবর দিন।[৫৭]

মহান আল্লাহ বলেন, হে মুহাম্মদ যখন আপনি নামায পড়বেন।[৫৮] আপনাকে প্রেরণ করলাম হে মুহাম্মদ।[৫৯]

তেমনি হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করি আপনার নবী মুহাম্মদ ﷺ এর অসীলায় যিনি রহমতের নবী ইত্যাদি।

আল্লামা এভাবে দলীল উপস্থাপন করেছেন। সুবহানাল্লাহ এরকম মনগড়া দলিল কোন আলিমগণ পেশ করেনি। কোন ফুকাহা দেননি, যেরকম দলিল কোন বিবেকবান কবুল করতে পারে না বরং কোন ছাত্রও গ্রহণ করতে পারে না; কেননা আয়াতের তাফসিরের সাথে এসকল দলিলের সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই।

কেননা, আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মানুষকে, ফেরেশতাদেরকে নয় এবং যে সকল আয়াতের তাফসিরে 'হে মুহাম্মদ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে, তার সম্বোধনকারী আল্লাহ, মুফাস্সিরগণ নয়।

মজার কথা হল, মহান আল্লাহ তাঁর পুরো কিতাবে কোথাও 'হে মুহাম্মদ!' বলে সম্বোধন করেননি; বরং হে নবী! হে রাসূল! হে কম্বল পরিধানকারী! হে চাদর পরিধানকারী! ইত্যাদি শব্দ দিয়ে সম্বোধন করেছেন।

আর হাদিছে 'হে মুহাম্মদ!' আমাকে ইসলাম সম্পর্কে খবর দিন ইত্যাদি রয়েছে এর উত্তর দিতে গিয়ে মুজাদ্দেদে আলফে আউয়াল প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ

---

[৫৭]. মিশকাত: ১১।
[৫৮]. মিশকাত: ৫৪৯।
[৫৯]. জালালাইন শরীফ।

ও অনুপম ফকিহ মোল্লাআলী ক্বারী হানাফী তাঁর প্রখ্যাত কিতাব 'মিরকাতে' বলেন,

**قيل ناداه باسمه اذا الحرمة تختصى بالامة فى زمانه او مطلق وهو ملك معلم ويؤيده قوله تعالى لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا اذا الخطاب للادمين فلايشمل الملائكة الا بدليل او قصد به المعنى الوصفى دون المعنى العلمى ولم ارمن ذكره واماماوردفى الصحاح من نداء بعض الصحابة باسمه فذاك قيل التحريم وقيل آثره زيادة فى التعمية اذ كانوا يعتقدون انه لاينباديه به الا العربى الجلف ويحتمل ان يكون هذا قبل تحريم ندائه ﷺ باسمه .**

এখানে তার নাম দিয়ে ডাকা হয়েছে। কেননা সম্মান তাঁর যুগে বা সাধারণভাবে উম্মতের জন্য জরুরি। আর যিনি হাদিছে ডেকেছেন তিনি হলেন ফেরেশতা। তার সমর্থনে তিনি এ আয়াত পেশ করেন। কেননা, সেখানে মানুষদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই তাতে ফেরেশতা অন্তর্ভুক্ত হবে না কোন দলিল ছাড়া। বা তা থেকে তিনি নাম উদ্দেশ্য করেননি বরং আভিধানিক অর্থ তথা হে প্রশংসিত ব্যক্তি নিয়েছেন এবং সিহাহ্ কিতাবে এসেছে তাঁকে কিছু সাহাবারা 'হে মুহাম্মদ!' বলে ডেকেছেন তা নিষেধ করার পূর্বে বা তারা গ্রামের লোক ছিল।[৬০]

মিরআতে এসেছে, 'হে মুহাম্মদ!' বলে ডাকা নিষেধের আয়াত নাযিলের পূর্বে বা ফেরেশতারা এর হুকুম থেকে ভিন্ন।[৬১]

সাহাবাদের আমল দেখুন! মুসলিম শরিফ প্রথম খন্ডে ১৪২ পৃষ্ঠায় এসেছে,

---

৬০. মিরকাত: ১/৫১।

৬১. মিরআত:১/২৫।

.....

**عن ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ.**

অর্থ: হযরত সওবান (র) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলের দরবারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ইহুদীদের বড় আলিম থেকে একজন এসে বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতি সালাম তখন আমি তাকে এমনভাবে ধাক্কা দিলাম যে, সে জমিনে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ল। সে বলল, আপনি আমাকে ধাক্কা মারলেন কেন? উত্তরে আমি বললাম, তুমি কেন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! বললে না। এ থেকে জানা গেল, 'হে আল্লাহর রাসূল' না বলাতে তাকে ঠেলে ধাক্কা দিয়ে হুঁশিয়ার করা সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত।[৬২]

**মাছআলা:**

**نداءے یا محمد** (এয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে সম্বোধন করা) সম্পর্কে মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী করাচীস্থ একটি মাহফিলে তাকরীর করার সময় বলেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "এয়া মুহাম্মদ" বলে সম্বোধন করা নিষেধ ও নাজায়েজ। তিনি আরো বলেন, "এয়া মুহাম্মদ" বলে সম্বোধন করা বেয়াদবী তথা আদব পরিপন্থী। যার দলীল হিসেবে,

**﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾**

আয়াতে কারীমাটি উপস্থাপন করেন। জনাব থানভী সাহেবের এ দলীলটি কতটুকু দুরস্ত ও বিশুদ্ধ?

---

[৬২]. মুসলিম, ১/২৫২।

হযরাত ছাহাবায়ে কেরাম হতে আরম্ভ করে বর্তমান পর্যন্ত সকল মুসলমানের আক্বীদা ও বিশ্বাস হচ্ছে- "এয়া মুহাম্মদ" এয়া রাসুলাল্লাহ" বলা সম্পূর্ণরূপে জায়েজ ও বরকতের কারণ। বেয়াদবীও নয়, খারাপও নয়। বরং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চ প্রশংসা ও তা'রীফ।

উলে- খিত আয়াতে কারীমা দ্বারা "নেদায়ে এয়া মুহাম্মদ" বলা নিষেধ হওয়ার ওপর দলীল উপস্থাপন করা সম্পূর্ণরূপে ভুল ও গলদ। হাদীছে পাকের বহু স্থানে **يامحمد** (এয়া মুহাম্মদ) শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। যদি এটি বেয়াদবী হয় তাহলে কখনো কিংবা কোন অবস্থায় **يامحمد** শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হতো না। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র আদব এহ্তেরাম তথা সম্মান প্রদর্শন সর্বাবস্থায় সবচেয়ে বড় ইবাদত। যেমনিভাবে ইবাদত যতবেশী করা হয় ততবেশী ছাওয়াব ও বদলা প্রাপ্তীর কারণ। অনুরূপ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব ও সম্মান ঈমানের মূল এবং আত্মার আলোক রশ্মির কারণ। শুধু তা নয় নামাজ, রোজা, সিজদা শারীরিক ইবাদত আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব, এহতেরাম এবং তা'রীফ প্রশংসার আলোচনা রূহ ও ঈমানের ইবাদত।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদবের ক্ষেত্রে যদি সামান্য অনু পরিমাণ ও কমতির সন্দেহ তথা কালিমা পড়ে, এর থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অভদ্রতা ও ঔদ্ধত্য করা কুফুরী।

উলে- খিত আয়াতে কারীমার শানে নুযুল সম্পর্কে বিজ্ঞ মুফাস্সিরিনে কেরাম বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কখনো ওয়াজ-নসীহত কিংবা জুমা ও ঈদের নামাজের জন্য একত্রিত হওয়ার জন্য হুকুম ফরমাতেন তখন মোনাফিক এবং তাদের দেখাদেখি কিছু সংখ্যক সহজ-সরল নওমুসলিমও তাড়াতাড়ি আসত না, আর যখন আসত আবার তাও চুপিসারে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার চেষ্টা করত, তাদের এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এ আয়াতে পাকের তাফসীর করতে গিয়ে সকল মুফাসসেরীনে কেরাম বহু মতামত ব্যাখ্যা করেছেন।

তাফসীরুল হাদীছ হাফেজ ঈসা আম্মার ইবনে কাছীর প্রমুখ মুফাস্সীরগণ বলেন, এখানে **دعاء** অর্থ হচ্ছে **التجاء** তথা মোনাজাত। অর্থ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়াকে নিজ নিজ দোয়ার সমতুল্য মনে কর না। আমাদের দোয়াসমূহের মধ্যে কিছু কবুল হয় আর কিছু কবুল হয় না। কিন্তু হযরাত আম্বিয়া আলাইহিমুচ্ছালামের সকল দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে থাকে। এজন্য এরশাদ হয়েছে–

**فانّ دعاءه مستجاب فاحذوره ان يدعوا عليكم لتهلّكوا**

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো, কেননা নিঃসন্দেহে তা ধ্বংস করে দেয়।

আবার কতক মুফাসসীরগণ চিৎকার দিয়ে ডাকা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উচ্চস্বরে আওয়াজ দিয়ে আহবান করা উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। **لا تجعلوا دعاء الرسول الخ** অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিৎকার করে আহবান করো না, বরং নিকটে গিয়ে ভদ্রসহকারে বিনয়-নম্রভাবে নিম্নস্বরে কথা বল।

"তাফসীরে রূহুল বয়ান"এর মধ্যে **لاتجعلوا دعاء الرسول الخ** এর মধ্যে **المصدر مضاف الى الفاعل** (**دعاء** শব্দটি মাছদার এবং **مضاف** হচ্ছে **فاعل** দিকে)। অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তোমাদেরকে ডাকবে। যদি **يا محمد** সম্বোধন করা এখানে নিষেধ হতো তাহলে **دعاء الرسول** হতো না, বরং **دعاء كم الرسول** হতো।

"তাফসীরে রূহুল মা'আনী" এর মধ্যে সকল তাফসীর **قيل بعض** কিংবা **قال بعض** বলে উলে- খ করে সর্বশেষ বলেন–

**نعم الاظهر فى معنى الاية ماذكرناه اولا كما لايخفى**

অর্থাৎ যদিওবা বহুলোক এই আয়াতের বিভিন্ন ধরনের অর্থ করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে শানদার এবং সুস্পষ্ট তাফসীর হচ্ছে যা আমরা সর্বপ্রথম উলে- খ করেছি।

যে সকল মুফাস্সীরগণ **دعاء الرسول** শব্দটি **مفعول مضاف اليه** বলেছেন, সে সকল মুহাক্কিক হযরাতগণও **اسم جنس ، نوعى اور نسبتى** অর্থাৎ জাতিগত, শ্রেণিবাচকগত এবং সম্পৃক্তগত নামসমূহ দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে ডাকা নিষেধ ফরমায়েছেন। যেমন: বাপ, চাচা, ভাই, ভাতিজা, পুরুষ, মানুষ, বশর ইত্যাদি সম্বোধন করো না।

জানা আবশ্যক যে প্রতিটি ব্যক্তির নাম ৯ প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন:

(১) اسم جنس جيسے حيوان ناطق (শ্রেণিবাচক নাম, যেমন- বাকজাতীয় জন্তু)

(২) اسم نوعى جيسے انسان (জাতিবাচক নাম, যেমন- মানব)

(৩) اسم صنفى جيسے رجل، امرأة (লিঙ্গবাচক নাম, যেমন- পুরুষ, মহিলা)

(৪) اسم سنّى جيسے بچہ، جوان، بوڑھا (বয়সগত নাম, যেমন- ছেলে, যুবক, বৃদ্ধ)

(৫) اسم دينى جيسے مسلمان، يہودى وغيرہ (ধর্মবাচক নাম, যেমন- মুসলমান, ইহুদী ইত্যাদি)

(৬) اسم قومی جیسے سیّد، پٹھان وغیرہ (বংশবাচক নাম, যেমন- সৈয়দ, পাঠান ইত্যাদি)

(৭) اسم ملکی جیسے عربی، بنگالی، ہندی (দেশ বা ভূখন্ডবাচক নাম, যেমন- আরবী, বাঙালী, হিন্দী)।

(৮) اسم ذاتی جیسے زید، بکر، خالد وغیرہ (স্বত্ত্বাবাচক নাম, যেমন- যায়েদ, বকর, খালেদ ইত্যাদি)

(৯) اسم وصفی جیسے عالم، حافظ، مولانا، قاری، مستری، حاجی، غازی

(গুণবাচক নাম, যেমন- আলেম, হাফেজ, মাওলানা, ক্বারী, মিস্ত্রী, হাজী, গাজি, ডাক্তার ইত্যাদি)

উলে- খ্য যে, সকল নামসমূহের মূল নাম হচ্ছে যে নাম দ্বারা স্বত্ত্বা নির্দিষ্ট হয়। আর তাহা হচ্ছে **اسم ذاتی**। যাকে আরবীতে **عَلَمْ** বলা হয়। এই নামটি সাধারণত অপর নামের সাথে খ্যাতি অর্জন করে, আর সে দ্বিতীয় নাম হচ্ছে **وصفی** তথা গুণবাচক নাম। এ নামটি স্বত্ত্বার যোগ্যতা ও গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। সাধারণত স্বত্ত্বাগত ও গুণগত নাম পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। এজন্যই আমাদের নাম **اسم بامسمّی** (স্বত্ত্বাগত ও গুণগতভাবে যথাযথ) হয় না। আমাদের নাম আমরা, কিংবা আমাদের মা-বাবা রেখেছেন, পরবর্তীতে গুণগত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নামের সৃষ্টি হয়। কাজেই আমাদের স্বত্ত্বাগত নাম কেবল স্বত্ত্বাগত নামই হয় আর গুণগত নাম কেবল গুণগত নামই হয়। অর্থাৎ উভয়ের সমষ্টিতে একটি নাম হয় না। একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক ব্যতীত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল নাম **عالم بالا** (আরশ তথা উর্ধ্বজগত) এর মধ্যে স্বয়ং কায়েনাতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ জাল্লাশানুহু রেখেছেন। তাঁর স্বত্ত্বাগত ও গুণগত নাম একই অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক স্বত্ত্বাগত ও গুণগতভাবে একটিই। তাঁর জাতিনাম মুহাম্মদ, আহমদ। যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদা ও প্রশংসা, সৃষ্টির মধ্যে কারো নাম **اسم بامسمّى** নয়। একমাত্র জনাবে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারকই হচ্ছে **اسم بامسمّى** তাঁর অনেক ছিফতি তথা গুণগত নামও জাতি নাম। যেমন- **رسول ، مرسل ، نبى، خاتم النبيين** এইগুলো তার ছিফত, কিন্তু জাতি নাম তথা **عَلَمْ**।

ইমাম আবু হাইয়্যান আন্দুলুছি বলেন-

**يبقى أن يجوز النعت لأنّ الرسول قد صار علمًا بالغلبة**

অর্থাৎ "ইয়া মুহাম্মদ এবং ইয়া রাসুলাল্লাহ" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ও না'ত বলা যায়েজ। রাসূল শব্দটিও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের **علم** তথা নাম হয়ে গেছে। অর্থাৎ এখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও রেসালতের পদ মর্যাদা বহাল রয়েছে। বাকী সকল আম্বিয়া আলাইহিচ্ছালামের নবুয়ত রহিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআন শরীফে **يا محمد** শব্দ দ্বারা সম্বোধন না করে **يا أيها الرسول، يا أيها النبى** ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে নবুয়তের অস্বীকারকারীদের সামনে নবুয়ত ও রেসালতের প্রকাশ করাটাই উদ্দেশ্য ছিল। কেননা কাফের লোক **يا محمد** বলাটা খারাপ মনে করতো না, বরং **يا نبى الله، يا رسول الله** বলাকে অস্বীকার করত। কাফের লোক মুহাম্মদ শব্দটিকে কেবলমাত্র তাঁর স্বত্ত্বাগত নাম মনে করত, অর্থের দিকে তারা খেয়াল করত না। যখন একবার "মুহাম্মদ" শব্দের অর্থের দিকে আবু জেহেল খেয়াল করল, তখন সে "মুহাম্মদ" বলা ছেড়ে দিল এবং **مذمم،** **مذمم** বলে রাসূলের শানে বেয়াদবী করতে লাগল। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খবর জানতে পারলেন, তখন তিনি হেসে

বললেন, সেই কোন **مذمم** কে খারাপ বলতেছে। আমি তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

রাসূলের ইহতেরাম ও সম্মান স্বয়ং আল্লাহকে সম্মান করা আর রাসূলের সন্তুষ্টি হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর সন্তুষ্টি, রাসূলের অনুসরণ হচ্ছে আল্লাহ পাকের অনুসরণ।

সকল মুফাস্সীরেনে কেরামগণ **قل** শব্দের তাফসীরের মধ্যে **يا محمد** লিখেছে। যেখানে **قل** শব্দটি **واحد مذكر حاضر** এর ছিগাহ আসবে সেখানেই **يا محمد** লেখেছে।

সারাংশ হচ্ছে- মুহাম্মদ শব্দটি যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছিফতি তথা গুণবাচক নাম উদ্দেশ্য হবে তখন **يا محمد** বলে সম্বোধন করা, কিংবা আহবান করা সম্পূর্ণরূপে জায়েজ। তাছাড়া রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে সাহায্য-প্রার্থনার সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজের-নাজের তথা অতীব নিকটে আছেন এই বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করে আরজি পেশ করার সময় **يا محمد** বলা সম্পূর্ণরূপে জায়েজ। যখন **يا محمد** কে গুণবাচক নাম অর্থের দিকে খেয়াল করা হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদা ও আজমতে শানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর উলে- খিত আয়াতে কারীমার মধ্যে **يا محمد** শব্দের সাথে কোন সম্পৃক্ত নাই।

অতএব উলে- খিত আয়াতের বিশেষণমূলক অর্থ হচ্ছে - হে মুসলমানগণ! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মানুষকে ডাকলে কিংবা আহবান করলে রাসূলের আহবানে অমনোযোগী হইওনা কিংবা তাঁর আহবানে অলসতা কিংবা বিরক্তবোধ করো না, যেমনিভাবে একে অপরের আহবানকে কখনো কখনো গুরুত্ব দিয়ে থাকো না। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহবানের ক্ষেত্রে তা যেন না হয়। বরং যখন কোন আহবান কিংবা ওয়াজ-নছিহতের জন্য বা কোন কাজের জন্য ডাকলে

যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে যাওয়ার অনুমতি না দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন অবস্থাতে ফিরে যেয়ো না। এমনকি যদি কোন ফরজ, ওয়াজিব কিংবা নফল নামাজ পড়া অবস্থায়ও যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহবান করেন তাহলে নামাজ ছেড়ে দিয়ে প্রিয় মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দিয়ে দৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হয়ে যাও।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজমতে শান দেখুন, তার নামাজ ভঙ্গ হবে না, যেখান থেকে নামাজ ছেড়ে রাসূলের দরবারে গিয়েছিল পুনরায় এসে ছেড়ে দেওয়া বাকী রাকাত নামাজ আদায় করে শেষ করবে। অজু ভঙ্গ হওয়া ব্যক্তির নামাজ ভঙ্গ হয় না। শুধু তা নয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহবান এর চেয়েও বেশী গুরুত্ববহ। কেননা রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে নামাজ ভঙ্গ করে রাসূলের দরবারে যাওয়া, কথা-বার্তা বলা, চলা-ফেরা করা, বাজারে যাওয়া আসা করাতে নামাজ ভঙ্গ হবে না, এগুলো শেষ করে বাকী নামাজ পড়লে হয়ে যাবে। **سبحان الله، الله اكبر** মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারের আজমতে শান অতুলনীয়। যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। উপরোক্ত তাফসীর উক্ত আয়াতে কারীমার আগের আয়াতের **سياق انما المؤمنون وسباق** তথা ইশারা ইঙ্গিত দ্বারাও সুস্পষ্ট। যেমন: **انما المؤمنون** থেকে আরম্ভ করে **بكل شئٍ عليم** পর্যন্ত আয়াতের উদ্দেশ্য, মাফহুম ও অর্থ এটিই যে, আমার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্জি ও অনুমতি ব্যতীত তাঁর মজলিস থেকে উঠে চলে যেয়ো না, তার ডাকে সাড়া দিয়ে দৌড়ে এসে উপস্থিত হও। অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহবানকে তোমাদের একে অপরের আহবানের ওপর কিয়াস করো না। তাঁর আহবানে দ্রুত সাড়া দিয়ে উপস্থিত হয়ে যাও এবং তাঁর অনুমতি ও ইজাজত ব্যতীত চলে যেয়ো না। কেননা তাঁর আহবানে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত ফিরে যাওয়া হারাম।

এটি সকল মুহাক্কেক মুফাস্সিরগণের তাহকিক মোতাবেক যে তারকিব করা হয়েছে, যে **دعاء** শব্দটি মাছদার যা **فاعل** এর দিকে **مضاف** তথা সম্পৃক্ত।

কতক মুফাস্সির বলেন- **دعاء** শব্দটি মাছদার যা **مفعول** এর দিকে **مضاف**। অতএব আয়াতে কারীমার অর্থ হবে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহবানকে তোমাদের আহবানের ওপর কিয়াস করো না, তোমাদের নাম তাঁর নামে নামকরণ করো না। যেমন: মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইত্যাদি। অনুরূপ তোমরা একে অপরকে যেভাবে আহবান করো (ডাকো) তেমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহবান করো না।

আ'লা হযরত ইমাম শাহ্ আহমদ রেজা আলাইহি রাহমাহ এর তাফসীর ও তরজুমায়ে ছদরুল আফাজিল সৈয়্যদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (রহ.) বলেন যে, যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহবান করবে, তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়া এবং আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং আদব সহকারে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। আর নিকটে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করা এবং বিদায় নেওয়ার জন্য ইজাজত তলব করা আবশ্যক।[৬৩]

[৬৩]. কানযুল ঈমান, খাযায়েনুল ইরফান, পৃষ্ঠা-৫২০।

.....

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

**﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا﴾**

**অনুবাদ ও তাফসিরঃ** হে নবী করীম ﷺ! আপনি উম্মতকে বলে দিন, আমি তোমাদের থেকে আহকাম-এ তাবলিগের বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাই না। শুধুমাত্র তোমরা আমার নিকটতমদেরকে মুহাব্বত কর। যে কোন ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করবে, আমি তার জন্য তাতে কল্যাণ বাড়িয়ে দিব।[৬৪]

এ থেকে বুঝা গেল, রাসূলের বংশধর সায়্যিদগণ; তাদেরকে রাসূলের খাতিরে মুহাব্বত করা জরুরি। অন্য বংশের জন্য সে মর্যাদা নেই।

তাবরানী আবু হাতিম ইবনে মরদীয়া ইবনে আব্বাস (রা) এর সূত্রে বর্ণনা করেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সে আত্মীয়স্বজন কারা যাদেরকে কোরআনে মুহাব্বত করা ফরয করে দিয়েছে? নবী ﷺ তখন উত্তরে বললেন, হযরত আলি, হযরত ফাতিমা, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বি আল্লাহু আনহুম।

আল্লাহর বাণী: **﴿وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ﴾** এখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করবে, তার নেকী বাড়িয়ে দেওয়া হবে এ আয়াতে **حَسَنَةً** শব্দ দ্বারা আহলে বাইতে মোস্তফা (দ.) এর মুহাব্বত করার কথা বলা হয়েছে।[৬৫]

---

৬৪. সূরা শুরা: ২৩।

৬৫. তাফসীরে ফয়যু, পারা: ২২ পৃ: ২৩।

.....

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

## ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾

**অনুবাদ ও তাফসিরঃ** হে প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি বলুন, যদি আল্লাহর জন্য কোন সন্তান থাকে, তখন আমি সর্বপ্রথমে তার ইবাদত করতাম।[৬৬]

হে প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি খ্রিষ্টানদেরকে বলুন, যদি রহমানের কোন সন্তান থাকে, তখন আমি প্রথমে ইবাদত করতাম।

কেননা, সন্তান হল পিতার রহস্য। তাই যে পিতার উপাসনা করা হবে তার পুত্রেরও উপাসনা করা আবশ্যক। সাথে সাথে যদি পুত্র থাকে, তখন আল্লাহ তার কাছে বন্দী হয়ে যেত; কেননা অনেক সময় পুত্রের খাতিরে পিতাকে অনেক কিছু করতে হয়। মহান আল্লাহ কারো নিকট বন্দী নন। তাঁর কাজে কেউ পরামর্শদাতা নেই। তাই আল্লাহর জন্য কোন পরামর্শ দাতা নেই তাই তার জন্য সন্তান থাকা অসম্ভব। বরং তাঁর গুণ হল,

**فرد صمد عن صفة الخلق برى • رب ازلى خلق الخلق كمال**

**لا ضد و لا ند و لا حد لربى • الآن كما كان و لم يلق زوالا**

**অর্থঃ** তিনি একক, সৃষ্টিজগতের গুণ থেকে পবিত্র, নিজের কামিল গুণের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ, তিনি সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন, তিনি স্থায়ী প্রভু।

তাই তাঁর কোন বিবি-সন্তান, বিরোধ শক্তি ও তাঁর কোন সীমা নেই। তিনি বর্তমানে আছেন, পূর্বে যেমন ছিলেন। তাঁর কোন ক্ষয় নেই।

মহান আল্লাহ বলেন, হে আমার প্রিয় হাবিব! আপনি কাফিরদেরকে বলুন; যদি আল্লাহর জন্য যে কোনভাবে কোন সন্তান প্রমাণিত হয় যেমন কাফিররা বলে যে, ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান। তখন আমি সবার আগে সে পুত্রের ইবাদতকারী হতাম এবং আমিই সর্বপ্রথম তাদেরকে সম্মান করতাম। হে

---

[৬৬]. সূরা যুখরুফ: ৮১।

কাফিররা, যদি কোন শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে তাঁর জন্য তোমাদের ধারণা মতে সন্তান প্রমাণিত হয় সর্বপ্রথম আমি তার আনুগত্য করব। কেননা ভাল কাজের আহবানকারীকে সবার আগে কাজ করতে হয়। মহান আল্লাহর জন্য সন্তান না থাকাটা নিশ্চিত। তা সত্ত্বেও তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

তাফসিরে 'রূহুল বয়ানে' এসেছে, এখানে কাফিরদের সাথে ঠাট্টা করা হয়েছে, যাতে তারা যে বিবেকহীন ও অজ্ঞ তা প্রমাণিত হয়।

তাই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, আপনি তাদেরকে বলুন! যদি আল্লাহর জন্য সন্তান হত যেভাবে তোমরা বলছ, ঈসা (আ.) আল্লাহর সন্তান হত তখন আমি তার ইবাদত করতাম; কিন্তু তিনি তাঁর সন্তান নন। তাই আমি তার ইবাদত করি না। তাই তোমরাও তাকে সন্তান বুঝ না এবং তাঁর ইবাদত করো না।

**প্রশ্নঃ إِنْ শব্দটি সম্ভাব্য বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাই বুঝা যায় সন্তান না হওয়াটা অকাট্য নয়?**

**জবাবঃ** এখানে إِنْ শব্দটি রূপকভাবে অসম্ভবের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তার মর্মার্থ হলঃ যখন মহান আল্লাহর জন্য সন্তান হওয়া অসম্ভব, তখন কাউকে তার সন্তান বলে ইবাদত করাও অসম্ভব।

সারকথা হল, আল্লাহর জন্য সন্তানের যিকর নিছক উপমা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে তারা নিশ্চত হয়ে যায়, যখন তাঁর জন্য সন্তান নেই তখন অন্য কারো ইবাদত বৈধ হতে পারে না।[৬৭]

কোরআন মজীদের অন্যান্য অলঙ্কারিক আয়াতসমূহের মধ্যে এটিও একটি।

তাফসিরে মাযহারী প্রণেতা বলেন, অসম্ভবকে যা বাধ্য করে তাও অসম্ভব। তিনি বলেন,

---

[৬৭]. ফয়যুল রাহমানঃ পারা:২৫ পৃঃ ২৭৯।

.....

**اذا المحال قد يستلزم المحال بالمراد نفيهما على ابلغ الوجوه**

তাই আয়াতে খুব অলঙ্কারিকভাবে উভয়টির অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তান হওয়া অসম্ভব তাই আমরা তাদের ইবাদত করাও অসম্ভব।

**وقيل العابدين بمعنى الانفين اى الجاحدين المنكرين لمازعمتم ، وقيل معناه انا اوّل من غضب للرحمن أن يقال له ولد ، فى القاموس عَبَدٌ الغضب والعرب الشديد والندامة وملامة النفس والحرص والانكار ، عَبِدَ كَفَرِحَ فى الكلّ والمناسب فى المقام الغضب والانكار .**

কেউ বলেন, এখানে **عابدين** অর্থ **جاحدين** অর্থাৎ, অস্বীকারকারী। অর্থাৎ আমি প্রথম অস্বীকারকারী হব। কেউ বলেন তার অর্থ, আমি তখন প্রথম রাগান্বিত ব্যক্তি হব সন্তানের ব্যাপারে। কামুসে তাই এসেছে।

ইমাম বগভী (রহ) ইবনে আব্বাস (রা)এর সূত্রে বলেন, এখানে **ان** নাবোধক। তাই অর্থ হবে, আল্লাহর জন্য কোন সন্তান নেই। আমি তার প্রথম সাক্ষী। কিছু মুফাসসিরীন বলেন, কেউ কেউ বলেন, এখানে **عابد** অর্থ-ঘৃণা করা। তখন অর্থ হবে 'আমি প্রথম ঘৃণাকারী'। হযরত সুফিয়ান সওরী প্রমুখ থেকে ইমাম বুখারী (রহ) বর্ণনা করেন, তাঁর তাফসিরে এটাও এসেছে যে তার অর্থ প্রথম অস্বীকারকারী। তখন **عابد** গঠিত হবে - **عَبَدَ يَعْبُدُ** থেকে।

শায়খ ইবনে জরীর সে অর্থের সমর্থনে আরবদের ব্যবহার ও আরবের পরিভাষা পেশ করেছেন। যেমন: একটি লম্বা হাদীছে এসেছে,

**فوالله ما عبد عثمان رضى الله تعالى عنه إن بعث**

হযরত আলী (র)এর একটি গবেষণার ব্যাপারে, আল্লাহর কসম হযরত ওসমান (র) কোন কিছু অস্বীকার করেননি এবং নির্দেশ দিয়েছেন মহিলাকে তার স্বামীর নিকট পাঠিয়ে দিতে।

এ হাদিছে **عبد** শব্দটি অস্বীকার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ এশব্দটি যখন **(باب سمع)** বাবে সামিয়া থেকে আসে, তখন এর অর্থ অস্বীকার করা হয়।

ইমাম ইবনে জরির (রা) নিজের দাবীর স্বপক্ষে আরবের কবিতা পেশ করেছেন।

ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে যদি রহমানের কোন সন্তান থাকে তখন আমি সর্ব প্রথম তা অস্বীকার করব; কিন্তু, তখন **شرط** (শর্ত) এবং **جزاء** (জযার) সম্পর্কে কিছুটা দুর্বলতা দেখা যায়।

হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, এখানে **إن** শর্তের জন্য না হয়ে নাবোধকের জন্য হবে। তখন অর্থ হবে, রহমানের জন্য কোন সন্তান নেই। যে কোন ব্যক্তি তাঁর জন্য কোন সন্তান প্রমাণ করবে, আমি সর্বপ্রথম তা অস্বীকারকারী হব।

কতিপয় মুফাস্সিররা এখানে **إن** কে না বোধকের জন্য নিয়েছে এবং **عابد** এর অর্থ সাক্ষ্যদাতা নিয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রহমানের জন্য কোন সন্তান নেই আমি তাঁর প্রথম সাক্ষী। হযরত কাতাদাহ (র) বর্ণনা করেন, এ আয়াতটি আরবি পরিভাষা মতে এসেছে। অর্থাৎ, যখন কথা সেরকম নয় তখন ইবাদতও হতে পারে না।

আবু সখর বলেন, তার অর্থ হল, রহমানের জন্য সন্তান নেই, তাই আমি সেই বিশ্বাস নিয়ে রহমানের প্রথম ইবাদতকারী এবং প্রথম তাওহীদবাদী। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলামও তাই বলেছেন।

ইমাম মুজাহিদ (রা:) **فأنا أول العابدين** এর অর্থে বলেন, আমি আল্লাহর ইবাদতকারীদের ও তোমাদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্তকারীদের প্রথম।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, তার অর্থ আমিই প্রথম অস্বীকারকারী।

শায়খ ইবনে কাসীর বলেন, এ সকল তাফসিরের মাঝে প্রথম তাফসির সমুচিত। কেননা, এটি শর্তযুক্ত বাক্য এবং যদি শর্ত অসম্ভব তখন ফলাফলও অসম্ভব হবে। কেননা, একজন সন্তানের মাঝে পিতার সব গুণ থাকে।

**প্রশ্ন:** দুনিয়াতে দেখা যায়, অনেক সময় পিতা-পুত্রের মাঝে সম্পদ ইত্যাদি গুণাবলীতে পার্থক্য দেখা যায়; যদিও বংশীয় সত্তা এক হয়?

**জবাব:** দুনিয়ার সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য তার শরীরের মূল অবস্থানুযায়ী হয়ে থাকে। সম্পদ ইত্যাদি উপার্জিত পূর্ণতা। তাই তাতে পার্থক্য থাকতে পারে। যে প্রভুকে মানুষের সাথে তুলনা করে সে তো নির্বোধ। সর্বপ্রথম কাফির হবে। প্রভুত্বের মাঝে অবশ্যই মূল উপাদানে মিল থাকতে হবে কেননা তিনি তো মূল। যেমন: পিতা পুত্রের মাঝে পারস্পরিক সত্তাগত মিল থাকা আবশ্যক। তাই যখন কেউ প্রভুত্বে সন্তান সাব্যস্ত করে, তখন প্রভুত্বের সকল গুণ তার মাঝে থাকতে হবে। কেননা সে অসম্পূর্ণ হতে পারবে না। কেননা যদি পুত্র প্রভুতে কোন একটি গুণও থাকে তখন তার মাঝে সকল গুণ থাকা আবশ্যক হবে। সেখানে কোন গুণে অসম্পূর্ণ থাকতে পারে না। তাই প্রভুত্বে ভিন্ন জাতের কেউ হতে পারে না। তাই সার কথা হল রহমানের জন্য যদি কোন সন্তান থাকত তখন তার ইবাদত সর্ব প্রথম আমার উপর ফরয হত তা সকল উম্মতের উপর জরুরি হত। অথচ আমার উপর এবং সকল উম্মতের উপর শুধুমাত্র ধারাবাহিকভাবে আল্লাহর ইবাদত ফরয। বরং প্রভুর কোনো সন্তান থাকা অসম্ভব। মেনে নিলাম যদি তিনি কাউকে সিজদা করার জন্য নির্দেশ দিতেন। তখন আমি তা সর্বপ্রথমে পালন করতাম। কেননা তা আসলে তাঁরই বন্দেগী। তাই মুশরিকরা বর্তমানে যে

মূর্তি ইত্যাদি বানিয়ে রেখেছে তা নির্দেশদাতার ইবাদত হিসাবে শয়তানের ইবাদত।

**প্রশ্নঃ** এখানে **إِنْ كان** শর্তের জন্য এসেছে, সাধারণত শর্ত এমন বিষয়ে হয় যা অনিশ্চিত। তাই নিশ্চিত বিষয়ে **إِنْ** ব্যবহার করা যায় না। তাই বলা যাবেনা যদি আগামীকাল দিন হয় তখন আমি আসব; বরং বলা যাবে আগামী কাল আসলে আমি আসব বা বলা যাবে আগামী কাল মেঘ হলে আমি আসব; কেননা মেঘ হওয়া অনিশ্চিত।

**জবাবঃ** হ্যাঁ শর্ত যদি নিশ্চিত বুঝায়, তখন তার নিশ্চিতকে অস্বীকার করবে, সন্দেহযুক্ত হওয়া জরুরি নয়; বাস্তবিক বস্তু না হওয়া জরুরি বরং সম্ভাব্য বস্তু হতে হবে। যেমনঃ বলা যায়, যদি আসমান যমীন মিলে যায় তখন মানুষ ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। আল্লাহ চাইলে তা যদিও সম্ভব; কিন্তু পবিত্র কুরআন ও হাদিছ দ্বারা বুঝা যায় তা হবে না।

দ্বিতীয়তঃ কখনো শর্ত এমনও হতে পারে যা একেবারে অসম্ভব। যেমনঃ

**﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾**

**অর্থঃ** আসমান যমীনে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মা'বুদ থাকত, তখন তা ধ্বংস হয়ে যেত।

এ সকল বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, **أوّل العابدين** এর অর্থ প্রথম ইবাদতকারী।

ইমাম সুদ্দী (রা:) বলেন, যদি রহমানের কোন সন্তান থাকত, তখন আমি প্রথম ইবাদতকারী হতাম। আল্লাহর সন্তানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কিন্তু বাস্তবে তার কোনো সন্তান নেই। এ মতটি শায়খ ইবনে জরির গ্রহণ করেছেন।

আল্লামা যামাখশারী বলেন, এ বাক্যটি খুব অলঙ্কারপূর্ণ স্টাইলে তাওহীদের প্রমাণ করে। অলঙ্কারশাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি (**نكات بديعية**) নিকাতে বদীয়িয়্যাতকে বুঝে নিতে পারে।

তাই যারা **إن** কে না বোধকের জন্য নিয়েছে বা **عابد** এর অর্থ অস্বীকারকারী নিয়েছে, তারা বালাগাত ও বদীশাস্ত্রের এ সকল সূক্ষ্মতা থেকে অজ্ঞ।

কিন্তু **إن** কে নাবোধক গ্রহণকারীর মাঝে রয়েছেন ইবনে আব্বাস, হাসান, সুদ্দী, কাতাদাহ, ইবনে যায়েদ (রা:) প্রমুখ।

**প্রশ্ন:** উল্লেখিত বর্ণনা মতে, যদি إن না-বোধকের জন্য নেওয়া হয়, তখন এটি সম্ভাবনা আছে যে, যেহেতেু সেখানে كان অতীতকালের জন্য এসেছে। তাই সন্দেহ উঠে যে আল্লাহর জন্য অতীতকালে সন্তান নেই, তবে ভবিষ্যতে হতে পারে কিনা? যদিও তা অসম্ভব।

**জবাব:** এখানে ভবিষ্যতে হওয়াটা আবশ্যক করে না। কেননা **كان** অতীতের জন্য যেমন আসে তেমনি অনেক সময় সবসময় ও চিরস্থায়ী বুঝানোর জন্যও আসে। যেমন: **وكان الله غفورا رحيما** অর্থাৎ আল্লাহ সদা-সর্বদা ক্ষমাকারী ও করুণাময়। এর অর্থে **مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ** চলে আসে। আবূ হাতেম ও ইমাম ফার্‌রা প্রমুখ বলেছেন, **عَبِدَ** বাতে 'যের' হলে কঠোর রাগান্বিত হওয়া বুঝায়।

আবু ওবাইদা (রা:) বলেন, এ অর্থ প্রথম অস্বীকারকারী। যেমন: আরবরা বলেন, **عَبِدَنِى حَقِّيْ اي جَحَدَنِىْ** সে আমার হক অস্বীকার করেছে।

**ولد** শব্দটি ওয়াও ও লামে যবর। আব্দুল্লাহ ইবনে ওসাব, তালহা, আ'মশ (রা:) প্রমুখ বলেন, ওয়াও তে পেশ ও লামে সাকিন **وُلْدٌ** আবূ হায়্যান আন্দুলুসী স্বীয় তাফসীরে এ রকম বলেছেন।

**এ আয়াতের শানে নুযূল হল:** নযর ইবনে আব্দুদ দার ইবনে কুসাই বলেন, সকল ফেরেশতা আল্লাহর কন্যা, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তখন

নযর ইবনে আব্দুদ দার বলল, এ আয়াত আমাদের সমর্থনে। তখন ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা বলল, এ আয়াত তোমাকে সমর্থন করে না বরং তা সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে একত্ববাদ প্রমাণ করে এবং তুমি মূর্খ ও অজ্ঞ। রহমানের জন্য কোন সন্তান নেই। অর্থাৎ

**ما كان للرحمن ولد فأنا اوّل المؤحدين من أهل مكة**

**সারকথা হল:** মুফাসসিরদের একদল, **عابد** শব্দকে **باب نصر** (বাবে নাসারা) থেকে নিয়েছেন এবং **إن** কে শর্তের জন্য নিয়ে পুরো বাক্যকে 'জুমলায়ে শরতীয়্যাহ বলেছেন। তারা খুব সুক্ষ্ম পদ্ধতিতে সন্তানকে অস্বীকার করেছেন।

আরেকদল বাবে সামিয়াহ থেকে নিয়ে **إن** কে নাবোধক নিয়েছেন। তখন তা দ্বারা সরাসরি সন্তান অস্বীকার হবে।

এখানে দু'টি তুলনা করলে বুঝা যায়, প্রথমটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রাধান্য। দ্বিতীয় মত বাস্তবিকতার আলোকে প্রাধান্য। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম সৃষ্টি হওয়ার কারণে প্রথম সাক্ষী হওয়াটাই অগ্রগণ্য। উভয় দলের শক্তিশালী দলীল রয়েছে। তাই ইমাম বুখারী (রহ) উভয়টি বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখিত আয়াতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়:

১. সুন্দর বালাগাত ও অলঙ্কারিকতা রয়েছে।
২. কোরআনের সূক্ষ্ম আয়াতের মধ্যে এটি একটি আয়াত।
৩. একত্বাবাদ ও প্রভুত্বের শানের একটি জামে আয়াত।
৪. শানে মোস্তাফা উদ্ভাসিত তথা তিনি প্রথম সৃষ্টি হওয়া, প্রথম একত্ববাদ স্বীকারকারী হওয়া, প্রথম একত্ববাদের সাক্ষীদাতা, সর্বপ্রথম তার নূর সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি তার গুণাবলী প্রমাণিত।

হযরত আতার (রা:) বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত, হে কাফির, ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিক তোমাদের জেনে রাখা উচিত তোমাদের ধারণা মতে যদি আল্লাহর সন্তান থাকে, তখন সর্বপ্রথম আমি তার প্রতি ঘৃণাকারী হতাম। তখন তা এখানে বাবে **سَمِعَ** থেকে হবে। হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রা:) এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, আমি যে রকম প্রথম ইবাদতকারী নয়, তেমনি তার কোন সন্তান নেই। যেমন বলা হয়, যদি তুমি লিখক হতে তখন আমি হিসাব নিতাম। যখন তুমি লিখক নয় তখন আমি হিসাব গ্রহণকারীও নয়।[৬৮]

---

[৬৮]. তাফসিরে ওয়াসিত: ৪/৪৩।

.....

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

**﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ﴾**

**অনুবাদঃ**

হে ঈমানদারগণ! ঐ সকল লোকদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করিওনা, যারা পরকাল থেকে নৈরাশ হয়ে গেছে, যেরকম কাফির কবরবাসীদের থেকে নৈরাশ হয়ে গেছে।[৬৯]

এ আয়াতে সকল লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়নি। শুধুমাত্র মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ আয়াতে যদিও মুফাসসিরিনরা কয়েকটি মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন তাফসিরে ইবনে কাসীরে প্রাধান্য মতকে এভাবে ব্যক্ত করেন, কবরবাসী থেকে নৈরাশ ব্যক্তি জীবিত কাফিররা। ( **كمايئس الكفار الأحياء** পৃ:৩৫৬)

তারা বলে কবরবাসীরা কিছু করতে পারে না; তাদের নিকট গমন করো না, তাদের থেকে কিছু তালাশ করোনা।

তাফসিরে বায়যাবিতে এসেছেঃ

**كما يئس الكفار من أصحاب القبور ، أن يبعثوا أو يثابوا أو ينالهم خير منهم**

যে রকম কাফিররা কবরবাসী থেকে নৈরাশ হয়েছে তাদেরকে উঠানোর ব্যাপারে কিয়ামতের দিন, বা কাফির নৈরাশ হয়ে গেছে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়ার ব্যাপারে বা তাদের থেকে কোন কল্যাণ লাভ করার ব্যাপারে।[৭০]

---

[৬৯]. সূরা মুম্তাহিনাহঃ ১৩।

[৭০]. বায়যাবীঃ ৬/২৪৯।

'আনওয়ারুত তানযিল আত্ তাফসীরে বায়যাভী' প্রণেতা এখানে তিনটি তাফসির বর্ণনা করেছেন, প্রথম দুটিতে কাফির থেকে মৃত কাফির উদ্দেশ্য এবং **من** এখানে কিছু বুঝানোর জন্য এসেছে। কিন্তু তৃতীয় তাফসিরে কাফির থেকে জীবিত কাফির এবং কবরবাসী থেকে সাধারণ কবরবাসীকে বুঝানো হয়েছে। তখন 'মিন' বর্ণনা দেওয়ার জন্য এসেছে। এমতকে মুফাসসিরীনরা প্রাধান্য দিয়েছেন। তখন অর্থ হবে, কবরবাসী থেকে কাফিররা নৈরাশ হয়ে গেছে, তারা কিছু করতে পারে না। অর্থাৎ তাদের ধারণা মতে কবরবাসীরা কিছু করতে পারে না। মহান আল্লাহ এ আয়াতে এ সকল কাফিরদের থেকে দূরে থাকার জন্য বলেছেন।

তাফসিরে আব্দুর রায্যাক্ব ২য় খন্ডের ২৩১ পৃষ্ঠায় এসেছে, কাতাদাহ (রা:) আয়াতের তাফসিরে বলেন, ইহুদীরা পরকাল থেকে নৈরাশ হয়েছে যেভাবে কাফিররা মৃত কবরবাসীগণ তাদের নিকট ফিরে আসার ব্যাপারে নৈরাশ হয়েছে।

হযরত আব্দুর রয্যাক (রা:) বলেন, মা'মার বলেন, কালবী আয়াতের তাফসিরে বলেন, ইহুদী-খ্রিষ্টানরা পরকাল ও প্রতিদান থেকে নৈরাশ হয়েছে, যেভাবে মৃত কাফিররা নৈরাশ হয়ে গেছে জান্নাত লাভের ব্যাপারে, যখন তারা তথায় তাদের ঠিকানা জাহান্নাম দেখল। আর আল্লামা সুয়ুতী (রা:) দূররে মনসুরে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি এ হাদীসটি আব্দুর রাজ্জাক (রা:) ইবনে মুনজিরের দিকে নিসবত করেছেন, তারা কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন।

জালালাইন শরিফে এসেছে, যা তারা ঈমান আনলে জান্নাত পেত। আর তারা আগুনের দিকে প্রত্যাবর্তিত হত না।

তারা পরকালের প্রতিদানের ব্যাপারে নৈরাশ হয়ে গেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতা পোষণ করার কারণে; যে রকম কাফির কবরবাসী পরকালের কল্যাণের ব্যাপারে নৈরাশ হয়ে গেছে। কেননা তাদের সামনে তাদের ঠিকানা পেশ করা হয়েছে।

**عن قتادة فى قوله تعالى: قد يئس الكفَّار ، قد يئسوا الأخرة يقول اليهود قد يئسوا أن يبعثوا كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ما توا –**

**قال عبد الرزاق : قال معمر وقال الكلبى فى قوله تعالى قديئسوا من الأخرة ، يعنى اليهود والنصاري يقول قد يئسوا من تواب الاخرة وكراتها ، كما يئس الكفار الذين ماتوا فهم فى القبور ايئسوا من الجنة حين رأوا مقاعدهم من النار ، ذكره السيوطى فى الدر المنثور ونسبه لعبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة .**

**قد يئسوا من الأخرة – من ثوابها مع إيقانهم بها لعنادهم النبى مع علمهم بصدقه – كما يئس الكفار الكائنون (من أصحاب القبور) المقرين من خيرى الأخرة إذ تعرض عليهم مقاعدهم من الجنة لو كانوا أمنوا وما يصيرون إليه من النار.**

তাফসির ছাড়াও যদি কোরআনে বাহ্যিক শব্দের উপর গভীর দৃষ্টি দেওয়া হয় তখন এ মাসয়ালা পরিষ্কার হবে যে, মৃত আহলুল্লাহ থেকে কিছু চাওয়া আল্লাহর নির্দেশ এবং তালাশ না করা কূফরির নিদর্শন। দেখুন এ আয়াতে দু'টি শব্দ এসেছে, (১) **يئس** (২) **كما** এখানে তাশবিহ দেওয়া হয়েছে। **يئس** শব্দটি অতীতকালের সীগাহ: তার অর্থ নিরাশ হওয়া। পরিভাষায়– কোন ব্যক্তির নিকট নিজের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পাওয়ার আশা নিঃশেষ হওয়া। তাই তাফসিরে রূহুল বয়ানে এসেছে, **اليائس انقطاع الطمع** নিরাশ হচ্ছে কারো নিকট নিজের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ভেঙ্গে যাওয়া।

আরবি অভিধান, মাজমাউল বিহার ৩য় খন্ডে এসেছে, **اليأس ضد الرضا** নিরাশ কারো নিকট আশা করার বিপরীত। যে ব্যক্তি দান করে লোকেরা তার নিকট এসে চাহিদা পেশ করে। তার সত্তার নিকট মানুষের চাহিদা পেশ করা হয়। যে দান করে না বা দিতে পারে না, মানুষেরা তার থেকে নৈরাশ হয়ে যায়। আভিধানিকভাবে মানুষেরা এ রকম স্থানেই **يوس** শব্দ সাহায্য করা ও কল্যাণ পৌঁছানোর ব্যাপারে ব্যবহার করে। এ আয়াতে কবরবাসী থেকে না চাওয়াকে পাপ বলা হয়েছে। তাই কবরবাসীরা খোদা প্রদত্ত শক্তি বলে লোকের চাহিদা পূরণ করে এবং চাহিদা পূরণ ঐ ব্যক্তি এভাবে করতে পারেন যেন তারা পরিপূর্ণভাবে জীবিত। এ আয়াত থেকে এই **اقتضاء الناس** দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। এ থেকে বুঝা যায়, মৃত্যুর পরে আল্লাহর ওলীর নিকট যাওয়া, তাঁদের থেকে কিছু চাওয়া বৈধ এবং তাঁদের দান থেকে নৈরাশ তাদের জীবনের অস্বীকার যা কূফরির স্তরে।

প্রমাণিত হয় যে, ইন্তেকালের পর আল্লাহর ওলীর কাছে যাওয়া এবং কিছু চাওয়া জায়েজ। আর এসব ব্যক্তির দান করা ক্ষমতা বা চাওয়া থেকে নিরাশ হওয়া তাদের জীবনীকে অস্বীকার করা। আর অস্বীকার করাটা কুফুরীর নামান্তর।

এখানে আরেকটি শব্দ **كما** ব্যবহার করা হয়েছে, আরবি ভাষায় তাকে হরফে তাশবীহ বলা হয়। এ শব্দটি দুই বাক্য বা দু'টি বিশেষ্যের মাঝখানে আসে। প্রথম বাক্যকে 'মুশাব্বা' বলা হয় এবং দ্বিতীয় বাক্যকে 'মুশাব্বা বিহী' বলা হয়। এখানে **قد يئسوا** মুশাব্বা এবং **يئس الكفار** মুশাব্বাবিহী এবং তাশবির কারণ নিরাশে, অন্য কোন প্রকারে নয়; নতুবা আখেরাত ও কবরবাসী শব্দের পার্থক্য হতনা। কেননা তাশবীহ পরিবর্তন চায়না; তাই যারা বলেন, **من أصحاب القبور** থেকেও পরকালের জীবন উদ্দেশ্য। যেমন: ওহাবীদের গুরুরা বলে, তা মূর্খতা। কেননা পরকালের জীবনের আলোচনা তো **من الآخرة** দ্বারা বুঝা যায়, তাই এখানেও যদি তা বুঝা যায়, তখন **تحصيل حاصل** বা শেষ পরিণতি আবশ্যক হয়ে যায়, যা অসম্ভব। সুতরাং প্রমাণিত হলো এখানে কবরবাসী থেকে চাওয়াই উদ্দেশ্য।

খাতেমুল মুহাদ্দিছ ও মুফাস্‌সির শাহ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রাহ) তাঁর কিতাব 'তাফসিরে আযিযে' লিখেন, সাধারণ লোক মৃত্যুর পরে শান্তি বা কষ্ট অনুভব করে, কিন্তু আল্লাহর বিশেষ ওলীদের ক্ষমতা দুনিয়া থেকে আরো বেশী বৃদ্ধি পায়। মানুষেরা নিজের চাহিদা ও কষ্ট তাদের দ্বারা সমাধান করে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে। এ থেকে বুঝা যায়, কবরবাসী থেকে তালাশ করা বৈধ। তাদের অসীলা গ্রহণ বৈধ। কিন্তু যারা অসীলা অস্বীকার করে অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন- **وابتغوا اليه الوسيلة** হে মুসলমান আল্লাহর নৈকট্য তালাশের জন্য অসীলা গ্রহণ কর। অর্থাৎ অসীলা ব্যতীত কোন কথা, দুআ বা ইবাদত কবুল হবে না। আল্লাহর ওলী বাহ্যিক জীবনে হোক বা কবরে স্থায়ী জীবনে থাকুক। তাঁর অসীলা দ্বারা দু'আ কবুল হয়। মসজিদের সম্মানকে অস্বীকার করতে পারে? কিন্তু অসীলা ব্যতীত মসজিদে যাওয়াও বেকার। মসজিদে নিশ্চিত কবুলিয়তের কোন গ্যারাণ্টি নেই। তা মহান আল্লাহর একটি ষ্টেশন। মহান আল্লাহ বলেন, **الخ اذ ظلموا انفسهم جاءوك** হে প্রিয় হাবিব, যখন এই জালিম নাপাক লোক আপনার কাছে আসে, ক্ষমা চাই, তখন তারা আমাকে ক্ষমাশীল অবস্থায় পাবে। এখানে মহান আল্লাহ দোষী ব্যক্তিকে মসজিদে পাঠাননি বরং বলেছেন নবীর কাছে যেতে। তারা যখন নবীর কাছে গিয়ে সম্মানিত হবে, তখন মসজিদে যাবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾

অর্থঃ হে বনী আদম, তোমরা তোমাদের সাজসজ্জা গ্রহণ করো মসজিদে আসলে। অর্থাৎ তোমরা মসজিদে নতুন কাপড় পরিধান করে আস। সেখানে আসার সময়ও সৌন্দর্য নিয়ে আস, অসীলা ছাড়া দু'আ কবুল হয় না।

হযরত শেখ সাদী (রা:) যার বুযুর্গী বিরোধিরাও মানেন, দু'আতে বলেন,

.....

خدایا بحق بنی فاطمہ # کہ بر قول ایماں کنم خاتمہ

অর্থ: হে আল্লাহ! বনী ফাতেমার অসীলায় আমার শেষ পরিণতি ঈমানের উপরে সমাপ্ত করুন।

হযরত ইমাম ইদ্রিস শাফেয়ী (রহ) একজন স্বতন্ত্র মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি তার বাড়ী ফিলিস্তিন থেকে সফর করে ইমাম আযম আবু হানিফার (রা) মাযারে গেলেন–

**قَالَ: إِنِّي لَأَتَبَرَّكُ بِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَجِيءُ إِلَى قَبْرِهِ، فَإِذَا عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ صَلَّيْت رَكْعَتَيْنِ وَسَأَلْتُ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ قَبْرِهِ فَتُقْضَى سَرِيْعًا -**

হযরত ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফা (রা)এর দ্বারা বরকত হাসিল করি এবং তাঁর কবরে আসি, যখন আমি কোন সমস্যার সম্মুখীন হই, তখন আমি ইমাম আবু হানিফার (রহ) মাজারে দু'রাকাত নামায পড়ি এবং আল্লাহর কাছে তার কবরের নিকট দু'আ করি। তখন তা দ্রুত কবুল হয় ।[৭১]

প্রখ্যাত ইমাম ও মুজতাহিদ শাফেয়ী কি মসজিদ চিনতেন না? তাঁর শহরে কি কোন মসজিদ ছিলনা? তিনি এত দূরের সফর কেন করলেন। এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর ওলীদের মাযার যিয়ারত করে স্বীয় মনোবাসনা পেশ করে দু'আ চাওয়াই আল্লাহর ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত এবং রাব্বুল আলামীনের নিকট অতীব গ্রহণযোগ্য। কেননা কবরবাসী আল্লাহর অলিগণ প্রয়োজন পেশকারীকে বরকত দান করেন।[৭২]

---

[৭১]. ফত্ওয়ায়ে শামী: ১/৫৫।

[৭২]. ফত্ওয়ায়ে নাঈমিয়্যাহ: ৪৫৮।

.....

**বিসমিল্লাহির রাহমনির রাহীম!**

# ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾

**আয়াতের অনুবাদ ও তাফসিরঃ**

ভ্রু কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, কারণ তার নিকট অন্ধ লোকটি এসেছিল। অর্থাৎ, সে সময় নূরী চেহারায় বশরী চেহারা প্রকাশ পেল। তাই তিনি তার দিকে দৃষ্টি দিলেন না বরং বশরী দৃষ্টি দিলেন; যখন তার নিকট একজন অন্ধ লোক এল। তার থেকে নূরানী চেহারা গোপন করা, রহমত ও মাহবুবের ইশকের পরিপন্থী। যদিও নিয়ম হিসাবে তা সঠিক। এর কারণে আশেকের অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং নবী করীম ﷺ এর শানের জন্য তা শোভনীয় নয়। প্রথমে আশেককে বুঝাও অতঃপর খারাপদেরকে দাওয়াত দাও আল্লাহ চাইলে তারা ইসলাম কবুল করবে। যদি তিনি না চান তারা ইসলাম কবুল করবে না। কিন্তু যারা আশেক তারা তো নিশ্চিতভাবে আশা নিয়ে আপনার দরবারে হাযির হয়; তাই তাদেরকে শান্তি দেওয়া রহমতের চাহিদা।

তিরমিযী শরীফে এসেছে, সে অন্ধ ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আমার কথা ভাল লাগছে না কি? তখন নবী ﷺ বললেন, না, ভাল লাগছে। এখানে অন্ধ বলাতে তার পক্ষ থেকে ওযর পাওয়া গেছে। অর্থাৎ, সে অন্ধ হওয়ার কারণে রাসূল যে মানুষের সাথে কথা বলছেন তা দেখেনি। যখন তিনি গোত্রীয় লোকদেরকে দাওয়াত ও উপদেশ প্রদানে ব্যস্ত থাকেন। এখানে নবী ﷺ এর শান ও মান সুস্পষ্ট । তিনি ইবনে উম্মে মাকতুমের অবস্থা, তার আন্তরিক নিষ্ঠা ও আসক্তির দিকে দৃষ্টি দেননি বরং তার দৃষ্টি কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোকদের দিকে ছিল।

**عَبَسَ এর তাহকীকঃ** তা অতীতকালীন রূপ। বাবে **ضرب** এর **العبوس** মাসদার থেকে, এর অর্থ ভ্রু কুঞ্চিত হওয়া। এটি একটি মুহাব্বাত বাকী রাখার সতর্ক। এখানে **جاء** এর যমীর নবী ﷺ এর দিকে ফিরেছে এবং

তা নবী ﷺ এর মুখ মোবারক ফিরানোর কারণ এবং অন্ধ বলা তার ওযরের দিকে ইশারা। তার থেকে কথা না বলা অন্ধ হওয়ার কারণে।

এ সূরাটি নবী ﷺএর সততা ও আমানতদারির বড় নিদর্শন এবং তা কোরআনের সততার প্রমাণ।

হযরত ইবনে যায়েদ বলেন, যদি রাসূল ﷺ ওহীর কোন কিছু গোপন করতেন তখন এটি গোপন করা দরকার ছিল। কিন্তু তিনি গোপন করেননি। আর গোপন করা তাঁর শানের জন্য নালায়েক। রাসূলের এ কাজ সৎচরিত্রের বিপরীত এবং উত্তমকে ত্যাগ করা তা তাকে পাপ ও দোষ বলা দুর্ভাগের ব্যাপার। কেননা তিনি সেখানে উত্তম আকাঙ্ক্ষার ইজতিহাদকে প্রাধান্যতা দিয়েছেন।

এখানে ইবনে মাকতুমকে অন্ধ বলাতে তার মান সম্মানে ক্ষুন্নতা দেখা দেয়। তার সম্মান মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সতর্ক করার মাধ্যমে করেছেন এবং সেখানে ইবনে মাকতুমের ওযর ও প্রমানিত। যদিও সে রাসূল ﷺ এর কথায় ব্যঘাত সৃষ্টি করেছেন। কেননা তিনি কুরাইশের নেতাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন তার সেই ওযরের কারণে কঠোরতার স্থলে নম্রতা দেখানো উচিত।

ইমাম সুহাইলি বলেন, দেখুন বাক্যের প্রথমে অনুপস্থিতের সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন কোন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হচ্ছে অতঃপর সতর্ক স্বরূপ উপস্থিত শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন আপনি কি জানেন। যেমন সাধারণত সমাজে প্রথমে মানুষকে সম্বোধন করা হয় অতঃপর সরাসরি দোষীকে সম্বোধন করা হয়। আল্লাহ তায়ালা জানেন এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃষ্টিপাত না করা কল্যাণের চিন্তায়। তিনি চান বড় বড় মুশরিকরা মুসলমান হয়ে যাক তখন অনেক সাধারণ মানুষ ইসলাম ধর্মগ্রহণ করবে। তাই মহান আল্লাহ প্রথমে নিজ হাবিবের সাথে সতর্ক স্বরূপ কথা বলেছেন অতঃপর সম্বোধন করে বলেছেন যাতে মাহবুবের নিকট দূরত্বের পরে নৈকট্য প্রকাশিত হয়।

**তাই অর্থ হবে:** হে প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপানকে তার ব্যাপারে কে বলেছে? আপনি তার অন্তরকে কিভাবে পরীক্ষা করেছেন, যে কারণে তার থেকে বিমুখ হলেন? এখানেই তা শেষ। এর পরে কর্ম নেই; বরং নতুন বাক্য শুরুহয়েছে।

এখানে মুফাসসিরীনরা একটি প্রশ্ন তুলেছেন; হযরত ইবনে মাকতুম মুসলমান হয়েছেন তিনি প্রয়োজন মাফিক মাসায়েল ও বিধান জানেন এবং কাফিররাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। নবী ﷺ এরকম অনেক বড় একটি কাফিরদের দল ইসলাম গ্রহণের আশা ছিল। তাই ইবনে উম্মে মাকতুম তাদের সাথে কথা বলাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে অনেক কল্যাণের পথে বাধা সৃষ্টি করার সম্ভাবনা ছিল। যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অবৈধ। কাফিরদের মুসলামন হওয়া গুরুত্ববহ। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী ﷺ যা করেছেন তা সঠিক ছিল। তা সত্ত্বেও মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিবকে কেন সতর্ক করলেন? যদিও তা মুহাব্বাতের ভঙ্গিতে?

ইবনে উম্মে মাকতুম মুসলমান ছিল, জরুরি বিধান সে জানত তবে তার মাঝে ফায়দা অর্জন নিশ্চিত ছিল।

আল্লামা কাযী সানাউল্লাহ পানিপথি (রহ) বলেন,

**وفى الاية إجلال للنبى صلى الله عليه وسلم بوجوه أحدها انه ذكر موجب الإنكار والاعراض عنه فى بدأ الكلام بلفظ الغيبة ولم يسند ذلك الفعل اليه بالتخاطب إيهاما بان من صدر ذلك الفعل كانه غيره وليس من شأنه ان يصدر منه مثله وتوجيه ذلك ان الأعمال انما هى بالنيات وما كانت فى نية النبي صلى الله عليه وسلم الاعراض عنه مطلقا بل كان غرضه ان هذا الرجل مؤمن لا يضره التأخير فى تعليمه ولا يخاف منه التولي والانحراف وان صناديد قريش عند الاعراض عنهم يذهبون ولا ينظرون ولو انهم**

.....

**أمنوا لا من معهم خلق كثير وتساع كلمة الله فبهذا الغرض كانه لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم التولي عن الأعمى وان وجد منه صورة التولي**

**অর্থ:** আয়াতে নবী করীম ﷺ এর কয়েক প্রকার সম্মান নিহিত রয়েছে। প্রথমত: এখানে নিষেধের জন্য বলা হয়েছে তাই সেখানে প্রথমে অনুপস্থিতের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সরাসরি তাকে সম্বোধন করা হয়নি। তাই মনে হয় কাজটি তার থেকে পাওয়া যায়নি, তার থেকে তা হতে পারে না। এ ব্যাখ্যা হল সকল কাজের প্রতিদান নির্ভর করে নিয়তের ভিত্তিতে। নবী ﷺ এর অন্তরে তার থেকে বিমুখতার নিয়ত ছিল না বরং তিনি চিন্তা করেছেন সে তো মু'মিন তার শিক্ষায় একটু দেরী হলে বুঝবে সে চলে যাবে না ও বিরক্ত হবে না; কিন্তু কুরাইশ নেতারা বিমুখ হলে চলে যাবে, তাঁর দিকে ফিরে তাকাবে না, যদি তারা ঈমান আনে তখন তাদের সাথে এক বিরাট দল ঈমান আনবে। তখন 'কালেমা' সম্প্রচার হবে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি অন্ধ থেকে বিরত রইলেন। তাই মনে হয় তাঁর থেকে অন্ধের ব্যাপারে কোন বিমুখতা আসেনি। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিমুখতা মনে হচ্ছে।

এ সকল গরীব সাহাবায়ে কেরাম সবসময় আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন তারা দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। প্রত্যেক বস্তু থেকে স্বাধীন ছিলেন মহান আল্লাহ কোরআনে তাদের মর্যাদা এভাবে বর্ণনা করেন যে,

**﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾**

**অর্থ:** যারা আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে যাঁরা খাস, সে কারণে জীবিকার সন্ধানে তারা ভূপৃষ্ঠে গমনাগমনে অপারগ; সেই সব দরিদ্রের জন্য ব্যয় কর! (ভিক্ষা হতে) নিবৃত্ত থাকার কারণে অজ্ঞ

লোকেরা তাদেরকে অবস্থাপন্ন বলে মনে করে। তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণের দ্বারা চিনতে পারবে, তারা লোকের নিকট ভিক্ষা করেনা এবং তোমরা শুদ্ধ সম্পদ হতে যা কিছু ব্যয় কর না কেন। বস্তুত: সে সমস্ত বিষয় আল্লাহ সম্যকরূপে অবগত আছেন।[৭৩]

হযরত শরফুদ্দীন হুমাইরী (রাহ.) 'আদাবুল মুরিদীন' কিতাবের ব্যাখ্যায় লিখেন, এ আয়াতের শানে নুযুল হল, মক্কা শরিফ ও মদিনা শরিফের আমিরগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব, শর্ত হল আপনি আপনার উম্মতের ফকিরদেরকে বলে দেন, তারা যেন আপনার নিকটে না থাকে। কেননা তাদেরকে দেখলে আমাদের লজ্জা লাগে এবং তাদের শরীর-কাপড় থেকে দুর্গন্ধ আসে। রাসূল (সা.) যেহেতু তাদের ঈমানের আশায় ছিলেন তখন তিনি সন্ধিআকারে হযরত ওমর (রা)কে সেই ফকিরদের নিকট পাঠালেন, তোমরা যেন কিছু দিন না আস। যাতে তারা ঈমান আনয়ন করে। এখনো হযরত ওমর (র) রওয়ানা দিলেন না হযরত জিব্রাইল (আ) এসেছেন এবং আয়াত নাযিল করলেন,

﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾

**অর্থ:** আর যেসব লোক সকাল-সন্ধায় তাঁদের প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করে, তাদেরকে আপনি দূরে সরিয়ে দিবেন না।[৭৪]

যখন কাফিররা জানতে পারল রাসূল ﷺ ফকিরদেরকে তাড়াবেন না, তখন তারা বলল, আমাদের ও ফকিরদের মধ্যে পালা ঠিক করেন একদিন তারা আসবে এবং একদিন আমরা আসব। হযরত ওমর (র) কে আদেশ দিলেন এরকম করা হোক তখন হযরত জিব্রাইল (আ) আসলেন,

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾

[৭৩]. সূরা বাক্বারা: ২৭৩।
[৭৪]. সূরা আনআম: ৫২।

**অর্থঃ** নিজেকে তুমি রাখবে তাদেরই সঙ্গে যারা সকাল ও সন্ধায় আহবান করে তাদের প্রতিপালককে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁদের (দরিদ্রদের) সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৭৫]

এখানে সবর অর্থ রুখে থাকা অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ ﷺ নিজের আত্মাকে তাদের সাথে রাখুন যারা আল্লাহর যিকরে মগ্ন। কেননা যদি তাদেরকে বলা হয় তোমরা তোমাদেরকে রাসূলের সাথে রাখ তখন তাদের জন্য তা ফযিলতের কারণ হবে; কিন্তু তাঁদের মর্যাদাকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য বলা হয়েছে, হে প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আপনাকে তাঁদের সাথে রাখুন।

যখন কাফিররা এ আয়াত সম্পর্কে অবহিত হল তখন তাদের জানা হল তাদের সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হল না। এখন আপনি তাদের এবং আমাদের মাঝে পালাক্রম করার প্রয়োজন নেই, তবে আপনি এতটুকু করেন আপনার চেহারা আমাদের দিকে রাখুন যেহেতু রাসূল তাদের ইসলামের আশায় ছিলেন তখন তিনি হযরত ওমরকে ফকিরদের নিকট পাঠালেন। কিছুদিন পর্যন্ত রাসূলের চেহারা তাদের দিক থাকবে না, তোমরা তা খারাপ মনে করো না, তখন মহান আল্লাহ একথাকে পছন্দ করলেন না। আর আয়াত নাযিল করে বলেন,

**﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾**

**অর্থঃ** হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি (চেহারাকে) অন্যদিকে ফিরিয়ে নিবেন না। যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছি। তার অনুসরণ আপনি করবেন না। সে তার খেয়াল খুশির

[৭৫]. সূরা কাহাফ: ২৮।

অনুসরণ করে  ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার অনুগত্য কর না।[৭৬]

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর যখনই তিনি তাদের দিকে দেখতেন তখন বলতেন মুবারক হোন মহান আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করেছেন।[৭৭]

(মিরআতুল আসরার, হযরত শায়খ আব্দুর রহমান চিশতি, তাহকীক ও অনুবাদ, ওয়াহেদ বখশী চিশতি সাবেরী, পৃ:১৭৪।)

[৭৬]. সূরা ক্বাহাফ: ২৮।
[৭৭]. মিরআতুল আসরার।

.....

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

## ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾

**আয়াতের অনুবাদ ও তাফসিরঃ**

হযরত শায়খ সুলাইমান জুমাল ইমাম সুদ্দী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন,

**قال السدى وَوَجَدَكَ ضَالاً} أي في قوم ضلال ، فهداهم الله بك. وقيل: وَجَدَكَ ضَالًّا ليلة المعراج حين انصرف عنك جبرائيل لا تعرف الطريق، فهداك إلى ساق العرش. وجدك ضالا لا إلى أحد على دينك بل أنت واحد ليس معك أحد فهديت بك الخلق . الخطاب للنبى صلى الله عليه و سلم و المراد غيره فقوله تعالى: ووجدك ضالا أى وجد قومك ضلالا فهداهم بك. و ليس المراد به الانحراف عن الحق لكونه مستحيلا عليه قبل النبوة و بعدها**

**অর্থঃ** ইমাম সুদ্দী বলেন, আল্লাহ আপনাকে পথভ্রষ্ট জাতির মাঝে পেয়েছেন, আল্লাহ তাদেরকে আপনার মাধ্যমে হিদায়ত দান করেছেন।

আপনাকে মি'রাজ রাতে পথভ্রষ্ট পেয়েছি যখন আপনার থেকে জিব্রাইল চলে গেলেন আপনি রাস্তা নির্ণয় করতে পারেননি; তখন তিনি আপনাকে আরশের দিকে নিয়ে গেছেন।

আল্লাহ আপনাকে একা পথে পেয়েছেন, কেউ আপনার ধর্মে ছিলো না। অতঃপর আপনার মাধ্যমে মানুষকে হিদায়ত দান করেছেন।

এখানে সম্বোধন যদিও তাকে করা হয়েছে তবে উদ্দেশ্য অন্য কেউ। অর্থাৎ, তখন আয়াতের অর্থ হবে **وَجَدَ قومك ضلالا فهداهم بك** আপনার জাতিকে পথহারা পেয়েছে আপনার মাধ্যমে হিদায়ত করেছেন।

তা থেকে হক বিমুখতা উদ্দেশ্য নয়; কেননা তাঁর জন্য নবুয়তের পূর্বে ও পরে দ্বীন বিমুখতা অসম্ভব।

আল্লামা শায়খ আহমদ মালেকী (রহ.) বলেন,

**وَوَجَدَكَ ضَالاً أي في قوم ضلال ، فهداهم الله بك.**

অর্থাৎ, আপনাকে পথহারা জাতির মাঝে পেয়েছেন তখন আল্লাহ আপনার মাধ্যমে তাদেরকে হিদায়ত দান করেছেন।

আল্লামা নিশাবুরী বলেন,

**مجاز فى الإسناد المعنى وجد قومك ضلالا فهداهم بك**

এখানে ইসনাদকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ আপনার জাতিকে পথহারা পেয়েছেন তখন তাদেরকে আপনার মাধ্যমে হিদায়াত দান করেছেন।

ইমাম আবু হায়্যান আন্দালুসি (রহ.) বলেন,

**ووجدك أى وجد رهطك ضالا فهداه بك، ثم أقول على حذف مضاف نحو و اسأل القرية ، لا يمكن حمله على الضلال الذى يقابله الهدى ، لأنَّ الأنبياء معصومون من ذلك (سورة يوسف)**

অর্থ: আপনার জাতিকে পথহারা পেয়েছেন, তখন তাদেরকে আপনার মাধ্যমে হিদায়ত দান করেছেন। অতঃপর বলি এখানে **مضاف** উহ্য রয়েছে। যেমন: রয়েছে **اسأل القرية** তে। এখানে হিদায়তের বিপরীত পথভ্রষ্ট নেওয়া যাবে না; কেননা নবীরা নিষ্পাপ।

ইমাম ক্বাযী আয়ায বলেন,

**هداية الناس به على اختلاف التفاسير ، المعنى ألم يجدك فهدي بك ضالا وأغنى بك عائلا وآوى بك يتيما ، قوله فهداى والفاء العاطفة لا الزائدة ، كما فى قوله تعالى ، وربِّكَ فكبِّر مع وجود عامل مقدّم ملا حق .**

আপনার মাধ্যমে হিদায়ত করেছেন এবং আপনার মাধ্যমে গরিবকে ধনী করেছেন এবং আপনার মাধ্যমে এতিমদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন।

**فهدى** শব্দে 'ফা' বর্ণটি আতফের জন্য এসেছে, অতিরিক্ত নয়। যেমন: অন্যস্থানে আল্লাহর বাণী **وربِّكَ فكبِّر** এখানে 'ফা' আতফের জন্য আনা হয়েছে। উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে, ইমাম খাফ্ফাজি (রা) বলেন, এখানে একটি কর্ম উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ,

**ووجدك رحيما فآوى بك يتيما و مهديا فهدى بك ضالا لكان آقرب**

আপনাকে রহমকারী পেয়েছেন আপনার মাধ্যমে একজন এতীমকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং আপনাকে হিদায়তকারী বানিয়েছেন, তখন আপনার মাধ্যমে একটি পথভ্রষ্ট জাতিকে হিদায়ত দান করেছেন।

ইমাম সুদ্দী (রহ.) বলেন,

**قال السدي : إنّه من قبيل خطاب السيد بما لعبيد أي وجدك، قومك ضالين فهداهم .**

এটা এমন যেমন কোন মাওলা তার গোলামকে বলে, তিনি তোমার জাতিকে পথহারা পেয়েছেন তখন তাদেরকে হিদায়ত করেছেন।

**قال بعض الشرّاح : إنَّه صرف للأيات عن ظاهر بلا دليل من غيرها مقتضى**

কতিপয় ব্যাখ্যাকারীগণ বলেন, এটি হল আয়াতের বাহ্যিক পরিবর্তন, যা চাহিদা ব্যতিরেকে প্রমাণাদি ছাড়াই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

উল্লেখিত আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে অনেক মুফাস্সির বিভিন্ন তাফসির পেশ করেছেন। আল্লামা রাযী (রহ.) অন্তত বিশটি মত বর্ণনা করেন। তাফসিরের মূল হল, **ضال** শব্দটির কী অর্থ: অভিধানে **ضلالت** এর বিভিন্ন অর্থ এসেছে, প্রকৃত পক্ষে দালালত অর্থ হল হিদায়তের বিপরীত। যেমন রেসালত বিমুখ হওয়া। তা যদি হকের রাস্তা বিমুখ হয় তখন শরীআতের পরিভাষায় তা কাফির। আর যদি মূল শরিয়তে ঠিক থাকে কাজে ভ্রষ্ট হয় তখন তা আমলি বিদ'আত। আর যদি বিশ্বাস বিনষ্ট হয় তখন তা হবে পথভ্রষ্ট। যারা প্রেমে আসক্ত তাদেরকেও প্রথভ্রষ্ট বলা হয় এবং যারা জানেনা তাদেরকেও **ضال** বা পুরানো প্রেমিক বলা হয়। নবী ﷺ কখনো কাফিরের অর্থে পথভ্রষ্ট ছিলেন না। তা তাঁর শানের বরখেলাফ ও নাজায়েয। এতে সকলের ইজমা হয়েছে; কিন্তু কিছু পথভ্রষ্ট লোক সেই অর্থও রাসূলের ব্যাপারে ব্যবহার করেছে। যেমন ইমাম রাযী কালাবী থেকে বর্ণনা করেন। সেই কালাবী শিয়া ছিল। কালাবী বলে, তাঁর অর্থ হল আপনাকে কাফিরাবস্থায় পেয়েছি একটি পথভ্রষ্ট জাতির মাঝে তখন আপনাকে হিদায়ত করেছি। (নাউযুবিল্লাহ)

বর্তমানে কিছু নাস্তিক লোকেরা এরকম কথা থেকে নবীর শানে বেআদবী করার দুঃসাহস পেয়েছে। অথচ তারা জানেনা এটি কত যে পথভ্রষ্ট ও মুরতাদী কথা ও তাফসির।

এই স্থানটি অনেক ভয়ংঙ্কর মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে বাঁচার তাওফীক্ব দিন ও হিদায়ত করুন।

ইমাম রাযী লিখেছেন, সকল উম্মতেরা একমত যে, নবী ﷺ জন্মের পর থেকে কখনো এক মিনিটের জন্যও কূফরী করেননি। মুতাজেলা বলেন, যুক্তির আলোকেও কুফরী তাঁর জন্য সত্তাগতভাবে অসম্ভব। ইমাম রাযী কিছু তাফসির কারদের আলোকে তা বাহ্যিকগত অসম্ভব বলেছেন।

প্রকৃত পক্ষে তা সবই বেহুদা কথা। কেননা মহান আল্লাহ যখন তাকে আযলে নবুয়ত দিয়েছেন তখন থেকে একটি সেকেন্ডও কূফরী করা অসম্ভব। তাই **ضالاً** দ্বারা এখানে শরয়ী পথভ্রষ্টা নেওয়া যাবে না। এমন শব্দ যা দ্বি-অর্থবোধক তাও মহান আল্লাহ নবীর জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন। তাই **راعنا** বলতে নিষেধ করা হয়েছে। বরং **انظرنا** বলতে বলা হয়েছে। যদিও **راعنا** শব্দের অর্থ খেয়াল করুন; কিন্তু তার দ্বিতীয় অর্থ খারাপ তথা গালি বা রাখাল। তাই সেই সন্দেহ থেকে বাচার জন্য সেই সব শব্দ নবীর জন্য ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে। অতএব কিভাবে সম্ভব এর চেয়ে কঠিন শব্দ নবীর শানে ব্যবহার করা? এ অর্থ রূপকভাবে যাই হোক না কেন তা রাসূলের জন্য ব্যবহার করা ঈমানদার মুসলিম ও জ্ঞানীদের নিকট বৈধ নয়। তা তার শানের বিপরীত।

যারা রাসূলের প্রেমিক তাদের জন্য এ ধরনের বর্ণনা নকল করাও উচিত নয়।

তাঁর শানে সাধারণ বেআদবী পূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা কূফরী। **راعنا** এ আয়াত দ্বারা শানে মুস্তাফার আদব সম্মানের মূলনীতি জানা গেছে যে, তাঁর শানে কিভাবে কথা বলতে হয়। দেখুন **راعنا** শব্দটি **مراعاة** শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ আমাদের অবস্থার দিকে খেয়াল করুন। তাই রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথা যদি সাহাবারা না বুঝতেন, তখন তাঁরা বলতেন হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দিকে খেয়াল করুন। অর্থাৎ আমরা বুঝার জন্য কথাটি আবার বলুন। এ শব্দটি মৌলিকভাবে ব্যবহার করা বেআদবী ছিল না; কিন্তু হিংসার বশবর্তী হয়ে ইহুদীরা এর অর্থকে ভুল অর্থে ব্যবহার করা শুরুকরে দিয়েছে। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের সেই শব্দ পরিবর্তন করে বলে দিলেন তোমরা **أُنْظُرْنَا** শব্দ ব্যবহার কর। কেননা ইহুদীরা সেই শব্দ দ্বারা আমাদের রাখাল বুঝান। তাই ইহুদীরা ঠাট্টা করার জন্য সেই শব্দ বলে থাকেন তাদের জিহবা নেড়ে।

এখানে খেয়াল রাখা দরকার: আরবী ভাষায় **راعنا** শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. অহংকার করা। ২. অজ্ঞ ৩. বেকূফ। তাই এ সকল অর্থ নেওয়ার সম্ভবনা নাকচ করার জন্য তা ব্যবহার থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

এ আয়াতের তাফসিরে কেউ কেউ কিছু সন্দেহ সৃষ্টি করেছেন, যার কারণে অকাট্য অর্থ শেষ হয়ে গেছে। তারা সম্ভাবনাময় খেয়ালী অর্থের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যার কারণে কোরআনের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়ে যায় এবং মতানৈক্যের দরজাও খুলে যায়।

হ্যাঁ অকাট্য অর্থকে বহাল রেখে এর সমর্থনে ও এর উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করার জন্য তাফসীর ও তাবীল পেশ করা সলফে সালেহীন ও আকাবেরদের অভ্যাস ছিল। ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন খামখেয়ালীরা নিজ নিজ পছন্দের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে কোরআনের তাফসির পেশ করা আরম্ভ করেছে, যার কারণে মানুষের মাঝে পথভ্রষ্টের সম্ভাবনা রয়েছে:

**﴿وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾** সেরকম আয়াতসমূহ থেকে একটি আয়াত।

এখানে **ضلالت** (দালালত)কে হিদায়াতের মোকবেলায় গ্রহণ করেছেন। চাই দালালত আভিধানিক হোক বা পারিভাষিক হোক বা বিশ্বাসী হোক এবং তা নবীর সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। জ্ঞানীরা কি তা মেনে নিতে পারে? কখনো মেনে নিতে পারেনা। এ আয়াতের কিছু আলিমদের বিভিন্ন তাফসির তুলে ধরব। ইনশাআল্লাহ

এখানে এর প্রকৃত ও মূল অর্থ কি? এর দিকে জ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তারা যেন চিন্তা করে। যাতে তারা শুধুমাত্র জাহেলি সাহিত্য, অভিধানের উপর ভিত্তি করে কোরআন বুঝার মাধ্যম না বানায়। রেসালতের শান মতে তাফসির করতে হলে প্রথমে আরবী গ্রামার, তারকীব বুঝে নিতে হবে। অতঃপর অর্থ বুঝতে হবে। এখানে **ضلالت** কি রাসূলের সাথে সম্পর্ক না জাতির সাথে?

**﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ এর তারকীব:** এখানে **واو** হরফে আতফ, **الم يجد** এর উপরে **وجد** ক্রিয়া আল্লাহ শব্দ কর্তা **(أفعال قلوب)**

কাফ কর্ম **(مفعول به)** এখানে **وجد** এর জন্য একটি কর্ম **(مفعول)**যথেষ্ট। আর যদি **وجد**কে অন্তরের ক্রিয়া হিসাবে নেওয়া হয়, তখন এর অর্থ **علم** হবে। তখন দু'টি কর্ম বা **مفعول** থাকা জরুরী। তখন এ দ্বিতীয় কর্মকে **(مفعول)** উহ্য মানতে হবে। কেননা দলীল ও ইঙ্গিত মোতাবেক এর এক **مفعول** কর্মকে উহ্য রাখা জায়েজ। আর এই উহ্য **مفعول ثانى** টি হল **مهديًا**।

তখন পুরো বাক্য ইমাম খোফ্ফাজি (রহ.)এর মতে এভাবে হবে: তিনি বলেন,

**لوجعل وجد متعديًا إلى المفعولين حُذف أحد هما أي ووجدك رحيما فآوى بك يتيما و مهديا فهدى بك ضالا لكان أقرب**

অর্থাৎ **وجد** শব্দটি যদি দুটি মাফউল **(مفعول)** এর দিকে মুতা'আদ্দি হয়, তখন একটিকে বিলুপ্ত করা হবে। এ ব্যাখ্যা মতে অর্থ হবে, আপনাকে মেহরবান পেয়েছেন, তাই আপনার মাধ্যমে ইয়াতীমকে আশ্রয় দিয়েছে। আপনাকে হিদায়াতকারী পেয়েছেন, তাই আপনার মাধ্যমে পথভ্রষ্টদেরকে হিদায়ত দান করেছে, এ অর্থই অধিক নিকটবর্তী। তখন **ضالا** শব্দটি কর্ম আগে এসেছে। আর 'ফা' বর্ণটি হল **اجزاء-هدي** হল ক্রিয়া **(فعل)** আর **الله** হল কর্তা বা **فاعل**। এ আয়াতের অর্থের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইমামুল মুহাদ্দেসীন আল্লামা ক্বাযী আয়ায বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন,

**الم يجدك فهدى بك ضالاً وأغنى بك عائلاً وأوى بك يتيمًا**

তম্মধ্যে একটি হল- হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাকে কি পাইনি? অতঃপর আপনার মাধ্যমে পথহারাকে হিদায়ত দান করেছি এবং আপনার মাধ্যমে অসহায়কে সম্বল দিয়েছি এবং আপনার মাধ্যমে ইয়াতিমকে আশ্রয় দিয়েছি।

ইমাম কুরতুবি (রহ.) নিজ তাফসিরে লিখেন,

**وجدك ضالاً أي فى قوم ضلال فهداهم الله بك**

আপনাকে পথভ্রষ্ট জাতির মাঝে পেয়েছেন, তখন আল্লাহ তাদেরকে আপনার মাধ্যমে হিদায়ত দান করেছেন।

ইমাম কুরতুবি বলেন, এ তাফসিরটি হল মুফাসসিরীনের একটি বড় দলের তাফসির।

রূহুল বয়ানে এসেছে,

**وجدك بين الضالين فهداهم بك فعلى هذا يكون الضلال صفة قومه**

তিনি আপনাকে পথহারাদের মাঝে পেয়েছেন, তখন তাদেরকে আপনার মাধ্যমে হিদায়ত দান করেছেন। তখন পথভ্রষ্ট গুণটি তাঁর জাতির গুণ হবে।

ইমাম রাযির তাফসিরের সারসংক্ষেপ হল,

**ووجدك قومك ضالا فهداهم بك وبشرعك**

অর্থ: মহান আল্লাহ আপনার জাতিকে পথভ্রষ্ট পেয়েছেন, তখন আপনার পবিত্র সত্তা দিয়ে এবং আপনার শরীয়তের মাধ্যমে তাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন।

ইমাম আবু হায়্যান আন্দালুসি (রহ.) বলেন,

**لقد رأيت فى النوم أنى افكر فى هذه الجملة فاقول على الفور ووجدك اى وجد رهطك ضالا فهداه**

অর্থাৎ আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি এ আয়াতের অনুবাদ নিয়ে চিন্তা করছি, তখন স্বপ্নে আমি অনুবাদ করতে দেখলাম মহান আল্লাহ আপনার জাতিকে পথভ্রষ্টাবস্থায় পেয়েছেন, তখন তাদেরকে হিদায়ত করেছেন।

এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে, এ অনুবাদ ও তাফসির তো স্বপ্নের তাই তা গ্রহণযোগ্য হবে না, শরীয়তে নবী ছাড়া অন্য কারো স্বপ্ন দলীল হতে পারে না।

তার জবাব হল, এ তাফসির লিখার সময় ইমাম আবু হায়্যান আন্দালুসী স্বপ্নে ছিলেন না; বরং তিনি জাগ্রত অবস্থায় লিখেছেন। আর তা সঠিক বুঝে লিখেছেন তার কারণ হল, সে সকল মুফাসসিরীনের অন্তরে রাসূল ﷺ এর আদব ও সম্মান পুরোপুরি ছিল। যেহেতু এ আয়াত বাহ্যিক দৃষ্টিতে পথভ্রষ্টতার সম্পর্ক রাসূলের সাথে হচ্ছে; তাই অনুবাদ লিখতে গিয়ে দুঃশ্চিন্তা দেখা দিল, তার জন্য দিন-রাত চিন্তা-ভাবনা করছেন; পরিশেষে ভাল স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা **وجدك أي رهطك ضالا فهداه** তা নিরসন করে দিলেন। তাতে রহস্য হল, আল্লাামা এ আয়াতের নিশ্চিত তাফসির দিয়ে করেছেন তখন তাতে রাসূল ﷺ এর উপর বড় অবদান বুঝা যাচ্ছে। তিনি সম্ভাবনাময় তাফসিরকে রদ করে দিয়েছেন।

**উল্লেখিত তাফসিরে একটি প্রশ্ন জাগে যে, ضالا** শব্দকে **هدى** এর কর্ম বানানো ঠিক হবে না; কেননা আয়াতে **وجد** অন্তরের ক্রিয়া ( **أفعال قلوب**) যার জন্য দু'টি কর্ম দরকার। তাই আরবী ব্যাকরণ মতে **ضالا** শব্দকে **هدى** ফে'ল এর **مفعول** বানানো যাবে না।

**তার জবাবঃ** প্রত্যেক স্থানে **وجد** এর জন্য দুটি কর্ম হওয়া জরুরি নয়। যদি তা **علم** এর অর্থ হয় তখন এর জন্য দু'টি কর্ম দরকার; কিন্তু যখন সে অর্থে ব্যবহার না হয় তখন তা অন্তরের ক্রিয়া হবেনা এবং দু'টি কর্মেরও প্রয়োজন হবে না। সকল নাহুশাস্ত্রবিদদের বিধানে এ নীতি বর্ণনা করেছেন।

**الخامس وجد بمعنى علم واعتقد، فإن لم تكن بمعنى العلم لاعتقادى ، لم تكن من هذا الباب (جامع الدروس العر بيه)**

অর্থাৎ **أفعال قلوب** এর মধ্যে পঞ্চম ফে'ল হল, **وجد**, যা **عِلْمٌ** ও **اِعْتَقَدَ** অর্থে ব্যবহৃত হয়। যদি **علم** অর্থে ব্যবহৃত না হয়। তখন তা **أفعال قلوب** হবে না। অর্থাৎ এ সময় **وجد** শব্দটির জন্য দুটি **مفعول** (মাফউল) এর প্রয়োজন হবে না। (**جامع الدروس العربية**)

এ নীতির ভিত্তিতে ইমাম কাযী আয়ায আয়াতের অর্থ করে বলেন, **ألم يجدك فهدى بك ضالاً** আমি কি আপনাকে পাইনি, অতঃপর আপনার মাধ্যমে পথহারাকে হিদায়ত করেছি।

এখানে মুসলিমের টীকাকার কাযী আয়ায স্পষ্টভাবে **ضالاً** কে **هدى** এর অগ্রগামী কর্ম **(مفعول مقدّم)** হিসাবে ঘোষণা করেছেন। যদি এখানে **وجد**কে অন্তরের ক্রিয়াও বানা হয় তখনও **ضالا** কে কর্মের আগে এসেছে বলা যাবে। তখন **وجد** এর দ্বিতীয় কর্ম উহ্য থাকবে তথা **مهديا**। তখন অধিকাংশ মুহাক্কিকীনের নিকট অর্থ হবে আপনাকে দয়াবান পেয়েছি তাই আপনার মাধ্যমে ইয়াতিমের আশ্রয় দিয়েছি এবং হেদায়তকারী পেয়েছি তখন আপনার মাধ্যমে আপনার জাতিকে হিদায়ত দান করেছি। [ ইমাম খাফ্‌ফাজী (রহ.) ]

**ضالا** কে কর্ম আগে এসেছে বললে অর্থে কোন ধরণের সমস্য হয়না, আয়াতের তারকিবেও কোন সমস্য হয়না; বরং তা দ্বারা রাসূলের সাথে বেআদবী থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায়।

হ্যাঁ যদি কর্মের আগে বলাতে কোন সমস্যা দেখা দেয়, তখন তা থেকে বিরত থাকা চাই; বরং অনেক সময় কোন কল্যাণকে সামনে রেখে কর্মকে ক্রিয়ার পূর্বে আনা হয়। যেমন: **إِيَّاكَ نعبد و إِيَّكَ نستعين** কর্ম (**مفعول**) সবসময় ক্রিয়া (**فعل**) এর পরে আসে তবে কখনো কোন গুরুত্বপূর্ণ কথার কল্যাণের জন্য পূর্বে আনা যায় নতুবা সূরা ফাতেহার এ আয়াতে নাহুভী ভুল পরিলক্ষিত হবে।

নাহুবিদরা বলেন, (**فاعل**) কর্তাকে ক্রিয়ার (**فعل**) পূর্বে আনা যায়না; কিন্তু (**مفعول**) কর্মকে (**فعل**) ক্রিয়ার পূর্বে আনা যায়। কখনো আগে আনাটা ওয়াজিব হয়ে যায়। কখনো তা নিষেধ হয়ে যায়। আর এ দু' অবস্থা ছাড়া বাকী সকল স্থানে উভয়টিই জায়েয স্তরে থাকে। উল্লেখিত আয়াতে এ দু'অবস্থা নেই। তাই তাতে বৈধ অবস্থা বের হয়ে যাবে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, আয়াতে যদি **ضالا** কে **وجد** এর ( **مفعول ثانى**) কর্ম বানানো হয় তখন অর্থের মধ্যে সমস্যা দেখা দেয় যে, পথভ্রষ্টতার সম্পর্ক রাসুলের সাথে হয়। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, **ما**

**ضل صاحبكم و ما غوى** তোমাদের পথপ্রদর্শক পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। তাই এখানে সেই প্রসিদ্ধ অর্থ যদি নেওয়া হয় তখন কুরআনের আয়াতের মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং তাতে রেসালাতের মানহানি হয় যা কখনো পবিত্র কুরআনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতে পারেনা।

তাই ইমাম শেহাবুদ্দীন (রহ.) আয়াতের অর্থ এভাবে বর্ণনা করেন,

**والحامل عليه إن وصف النبى ﷺ بالضلال بحسب معناه المشهور غير ظاهر، فلذا صرفه عن ظاهره**

**অর্থঃ** এ অর্থ বর্ণনা করার কারণ, **ضلالت** এর প্রসিদ্ধ অর্থ রাসূলের দিকে করা বৈধই নয়। তাই বাহ্যিক অর্থ হতে অন্য অর্থে ফিরে যেতে হয়েছে।

**ফায়দাঃ** যারা ঈমান, জ্ঞান, আদব ও নবুয়াতের সম্মান অন্তরে রাখেন, তারা তো নাহুর নীতি দেখেন না। তাঁরা নিশ্চিত চিন্তায় থাকেন, যেন এমন অর্থ তালাশ করে বের করা হোক, যা নবুয়ত ও রাসূলের শানে আঘাত করবে না।

দ্বিতীয়তঃ নাহুর রীতি-নীতি ইহাকে সমর্থন করবে নতুবা কোরআন এসকল রীতির অনুগামী নয় বরং রীতি-নীতি কুরআন ও এর উদ্দেশ্যে অনুসারী।

ইমাম রাযী আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অতঃপর তারা এ আয়াতের বিভিন্ন প্রকার তাফসির পেশ করেছেন। তিনি এ আয়াতের বিশটি তাফসির লিখেছেন।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) এ আয়াতের নয়টি তাফসির পেশ করেছেন। মুফাসসিরীনরা এআয়াতের কমপক্ষে তিন চারটি তাফসির বর্ণনা করেছেন। তাই এখানে একটি দুর্লভ ক্বেরাতের কারণে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও নাহভী তারকীব তাফসির পেশ করা হচ্ছে, যা আহলে বাইত করেছেন। সাধারণ আশেকে রাসূলদের নিকট তা পছন্দ হবে।

ইমাম হাসান (রা) এ আয়াতের একটি ক্বেরাত এভাবে বর্ণনা করেছেন, ইমাম কুরতুবী যা বর্ণনা করেছেন **وجدك الضالُّ فاهتدى** অর্থ যে পথভ্রষ্ট আপনাকে পেয়েছে সে আপনার মাধ্যমে হিদায়াত পেয়েছে।

এখানে পথভ্রষ্টতার সম্পর্ক রাসূলের সাথে নয় বরং জাতির সাথে, তখন **وجد** এর জন্য একটি কর্ম যথেষ্ট। তখন **وجد** এর কর্তা **الضالُّ** হবে। অবশ্য অন্যান্য আয়াতে **وجد** এর **فاعل** হবে **الله** আর **ضالا** শব্দটি **وجد** এর **مفعول** নয়। বরং **فاعل** এর হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম হাসান এটাকে কর্তা বানাইলেন।

**এখানে একটি প্রশ্ন হচ্ছে ক্বেরাত শায দিয়ে কিভাবে দলিল দেওয়া যেতে পারে?**

**জবাবঃ** আমাদের হানাফী 'আলিমদের নিকট শায ক্বেরাত দিয়ে দলিল দেওয়া জায়েজ। কেননা তা খবরে ওয়াহেদের স্তরে। তখন এর উপর আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

কিন্তু শাফেয়ী আলিমদের নিকট এর দ্বারা সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করে দলীল দেওয়া যাবে না। কিন্তু এ বর্ণনাকে তারা, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাফসীর হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম গাযালী বলেন,

**و احتمل أن يكون خبر أو لا يكون فلا يجوز العمل به**

অর্থাৎ, তা যদিও কোরআনের ক্বেরাত নয় তবে তা খবরে ওয়াহেদ ও সাহাবীর উক্তি উভয়টিই হওয়া সম্ভব সুতরাং যে ক্বেরাতে দু'টি সম্ভাবনা থাকে, এর উপর আমল করা যায়না।

ওলামায়ে আহনাফ বলেন, যদিও তা মুতাওয়াতির প্রমাণিত নয়; কিন্তু সাহাবী বা তাবেঈ তা বর্ণনা করা বা তা মাসহাফে অন্তর্ভুক্ত করা প্রমাণ করে যে, তিনি তা নবী ﷺ থেকে শুনেছে। তাই তা রাসূলের এমন সুন্নাত হবে, যা তাফসীর ও বয়ান হিসেবে এসেছে, তাই তা দ্বারা দলিল দেওয়া বৈধ।

ইমাম গাযালী (রহ.) আহনাফের রায় বর্ণনা করে বলেন,

**و قال أبو حنيفة يجب لأنَّه و إنَّ لم يثبت كونه قرآنا فلا أقلّ من كونه خبرا و العمل يجب خبر الواحد**

অর্থাৎ, ক্বেরাত শাযকে কোরআনের তাফসীর বানানো ওয়াজিব এর কারণ হল, তা যদিও কোরআনের আয়াত হিসাবে প্রমাণিত নয়; কিন্তু তা খবরে ওয়াহেদ হিসাবে গণ্য হবে এবং খবরে ওয়াহেদের উপর আমল ওয়াজিব।

**ফায়দা:** মহান আল্লাহ অঙ্গীকারের দিন সকল আত্মাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর হযরত আদম (আ) এর পিঠ মুবারক থেকে জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছেন, অতঃপর চার উপাদান দিয়ে প্রকাশ করেছেন, অতঃপর বললেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নয়? সকল আত্মারা উত্তর করলেন, হ্যাঁ আপনি আমদের প্রভু।

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন,

**أوّل ما خلق الله نورى و كل خلائق من نورى و أنا من نور الله**

**অর্থ:** সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন। আর সকল সৃষ্টিকে আমার নুর থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি হয়েছি।

**নবী করীম ﷺ এর মাকান বা অবস্থানস্থল সাতটি:**

প্রথম: তারকারাজির মধ্যে, দ্বিতীয়: আদম (আ) এর পিঠ মুবারকে, তৃতীয়: হযরত আব্দুল্লাহর মেরুদন্ডে, চতুর্থ: মায়ের পেটে, পঞ্চম: বেহেশতে, ষষ্ঠ: সাগরে মণিমুক্তায়, সপ্তম: প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে।

আলা হযরত শাহ্ আহমদ রেজা (রহ.) বলেন,

سنا ہے کہتے ہیں آقا رہتے فقط مدینے میں
غلط ہے وہ آقا رہتے ہیں
عاشقوں کے سینے میں

**অর্থ:** আমি শুনি প্রিয় নবী শুধুমাত্র মদীনাতে আছেন, তা ভুল। তিনি প্রত্যেক প্রেমিকের অন্তরে আছেন। [ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ভাল জানেন ]

# পরিশিষ্ট

## আক্বীদার প্রকারভেদ ও বিস্তারিত বর্ণনা

**প্রশ্নঃ আক্বীদা তথা দৃঢ়বিশ্বাস কত প্রকার? অর্থাৎ, পরিপূর্ণ ঈমানের অংশ কত প্রকার ও কি কি? এগুলোর সংজ্ঞা কি? বিস্তারিত বর্ণনা কর।**

**জবাবঃ** মুহাক্কিক্ব আলিমগণ বলেন, মৌলিকভাবে দৃঢ়বিশ্বাস তিন প্রকারঃ ১. তাওহীদের (একত্ববাদের) প্রতি ঈমান। ২. রিসালাতের (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি বিশ্বাস ও ৩. পরকালের প্রতি বিশ্বাস।

**পরিপূর্ণ ঈমানের দু'টি অংশঃ ১.** ঐ সকল বিশ্বাস যা অন্তরের সাথে সম্পর্কৃত ২. আমল সমূহ যা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে নির্গত। প্রথম প্রকার মূল ও সর্বোচ্চ বিশ্বাস। দ্বিতীয় প্রকার তা শাখা হিসাবে ধরা হয়। মৌলিক আক্বিদা দ্বারা অন্তর পরিষ্কার হয়। তাই বিশ্বাস সঠিক হওয়া ছাড়া কোন আমল কবুল হবে না।

আর মাযহাবের ভিন্নতার ভিত্তি আক্বিদার ভিন্নতার উপর নয়; বরং আমলের উপর। তাই চার মাযহাবের আলিমগণ আমল ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাস এক হওয়ার কারণে তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলা হয়।

ওহাবী, শিয়া, মুতাজেলা, খারেজী ইত্যাদি বিশ্বাসের ভিন্নতার বিভিন্ন নাম।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ আমলের গুরুত্বের সাথে বিশ্বাসের বিশুদ্ধতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। আক্বীদার ক্ষেত্রে তাওহীদ, রেসালত ও পরকালের বিশ্বাস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিকট অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

এ ভূমিকায় একথা পরিষ্কার হওয়া দরকার, আহলে সুন্নাতের আলিমদের নিকট তাওহীদ ও রেসালতের অর্থ কি? আহলে বিদআত আলিমরা এখানে কি কি ভুল করেছে?

ইসলামী মিল্লাতের মূলভিত্তি তাওহীদ ও রিসালতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসের উপর। এদু'টি বিশুদ্ধ হলে ঈমান বিশুদ্ধ হবে।

তাওহীদের প্রতি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশ্বাসের উপর কোরআন পাকের ইঙ্গিত বা দলীল রয়েছে। **عالم** আলম তথা দুনিয়ায় আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল বস্তুর নাম আল্লাহর একত্ববাদের দলীল; কেননা **عالم** অর্থ **ما يعلم به** বা যা দ্বারা কোন কিছু জানা যায়। কবি বলেছেন,

**ففى كل شيئ له آية : تدلّ على أنّه واحد**

**অর্থ:** 'প্রত্যেক বস্তুতে আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে এগুলো আল্লাহর একত্ববাদের উপর প্রমাণ বহন করে।' এ সকল প্রমাণাদি আল্লাহ তায়ালার তাওহীদের (একত্ববাদের) জ্ঞানার্জনে সহায়ক হবে।

যত দলীল জানা যাবে, তত তাওহীদ পরিপূর্ণ হবে এবং দলীলের স্বল্পতা তাওহিদের জ্ঞানে কমতি বুঝায়।

কোরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

**﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾**

অর্থ: এমনিভাবেই আমি ইব্রাহিমকে আসমান-যমিনের রাজত্ব অবলোকন করিয়েছি যাতে তিনি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।[৭৮]

হযরত ইমাম মোল্লাআলী ক্বারী হানাফী (রাহ.) এ আয়াতের অনুবাদ এভাবে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাহবুবকে লক্ষ্য করে বলেন, হে হাবীব! যেভাবে আপনাকে আসমান যমিনের আশ্চর্য দেখিয়েছি, তেমনি ইব্রাহিমকে (আঃ) আসমান যমিনের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে যাতে তিনি আল্লাহর উপর দলিল উপস্থাপন করে।

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, আসমান যমিনে যা কিছু রয়েছে, তা সবই আল্লাহর একত্ববাদের দলীল, এ সকল জ্ঞান দ্বারা তাওহিদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয় এবং একথা সকল ছাত্ররা জানে যে, عالم কে এ নামকরণের কারণ তা দ্বারা সৃষ্টিকর্তা প্রভুর দলিল দেওয়া যায়।

ইমাম মোল্লাআলী ক্বারী ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকারী একটি সূক্ষ্ম কথা বর্ণনা করেছেন; তা হলো উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞান ও দেখাকে মুশাব্বাহ বিহি করেছেন এবং হযরত ইব্রাহিম খলিলের (আ) জ্ঞান ও দেখাকে মুশাব্বাহ করেছেন এবং এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে মুশাব্বাবিহী তাশবিহের কারণে মুশাব্বাহ থেকে শক্তিশালী হয়; তখন তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা ইব্রাহিমের দেখা থেকে কিভাবে শক্তিশালী হতে পারে?

হাদীছের ব্যাখ্যাকারীগণ জবাব এভাবে দেন, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম প্রথমে দেখেছেন তার পরে বিশ্বাস অর্জন করেছেন। আর হাদিছে এসেছে প্রথমে রাসূলের জ্ঞান অর্জন হয়েছে তার পরে দেখেছেন। সেক্ষেত্রে

[৭৮]. সূরা আনআম:৭৫।

অগ্রগামী হল আল্লাহর দেখা ও জানা, এরপর আসমান-জমীনের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান পশ্চাৎগামী হয়েছে। এ কথা পরিস্কার হল যে, আল্লাহ হলেন মুকাদ্দাম আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মুআখখার। কারণ তিনি সৃষ্টিতে স্থানান্তরকারীর একমাত্র মাধ্যম।

হযরত মোল্লাআলী ক্বারী বলেন, **وبينهما بون بائن** এ উভয়ের মাঝে মর্যাদাগত অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। এ থেকে কোরআন-হাদীছ দ্বারা তাওহীদ প্রমাণিত হয়েছে। কারো কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এমন বিশ্বাস পাওয়া যায় যে, তার অমুখ বস্তুর জ্ঞান নেই, তখন একথার অর্থ হল তাওহীদ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ নয়। অথচ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তাঁর থেকে কোন বস্তুর জ্ঞান না থাকার অর্থ তাঁর তাওহিদ পরিপূর্ণ না হওয়া। তখন সমস্ত বিশ্বে কার জ্ঞান পরিপূর্ণ হবে? অর্থাৎ কারো জ্ঞান পরিপূর্ণ হবে না।

কিছু বিদাতী লোক তাওহীদের আক্বীদাকে উল্টিয়ে ফেলেছে যে, যদি কারো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এ বিশ্বাস থাকে যে, মহান আল্লাহ তাঁকে দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান দান করেছেন, তখন তা শিরক হবে।

অর্থাৎ, দলীল দ্বারা প্রমাণিত তাওহীদের আক্বিদাকে শিরক বানানো তাদের মতে পরিপূর্ণ একত্ববাদী। তাদের মতে তাওহীদের আক্বীদা হল নবীর নিকট দেওয়ালের পেছনে কি আছে? তাও জানে না। কিছু বিদাতিদের বিশ্বাস হল, শয়তানের প্রশস্ত জ্ঞানের কথা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত, নাউযুবিল্লাহ। তাদের কথা মতে শয়তানের তাওহীদের জ্ঞান নবীদের তাওহীদের জ্ঞানের চেয়ে বেশী পরিপূর্ণ।

**لا حول ولا قوة. استغفر الله ، نعوذ بالله من هذه الخرفات**

ইসলামি মিল্লাতের প্রথম ভিত্তি তাওহীদকে বিদাতিরা বিভিন্ন আবরণে ঢেকে ফেলেছে।

**আর দ্বিতীয় ভিত্তি হল রেসালত**

বিদাতিদের সে ব্যাপারে বর্ণনা দেওয়ার পর আমি আহলে সুন্নাতের আক্বীদার বর্ণনা দিচ্ছি।

পবিত্র কোরআন মজিদে এসেছে,

**﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾**

আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং বিচার দিবসের প্রতি ঈমান এনেছি; অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয়।[৭৯]

**﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾**

**অর্থঃ** আর হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! স্মরণ করুন সে সময়ের কথা, যখন আপনার রব ফেরেশতাগণকে বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।[৮০]

এ আয়াতে প্রশ্ন হয় যে, খলিফা কাকে বলা হয় এবং তা কখন ঠিক করা হয়? সাধারণত যখন প্রধান পরিচালক কোন কাজ শেষ করতে না পারেন

[৭৯]. সূরা বাক্বারাঃ ৮।
[৮০]. সূরা বাক্বারাঃ ৩০।

তখন তিনি প্রতিনিধি ঠিক করেন। মহান আল্লাহ তো প্রত্যেক প্রকার অক্ষমতা থেকে পবিত্র তাই তার প্রতিনিধি ঠিক করার বা কি প্রয়োজন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আল্লামা নাসিরুদ্দনি বায়যাবী (রাহ:) বলেন,

**كذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم، لا لحاجة به تعالى إلى من نبويه، بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه، وتلقي أمره بغير وسط،**

**অর্থ:** মহান আল্লাহ এভাবে প্রত্যেক নবীগণকে ভূখন্ডে প্রতিনিধি ঠিক করেছেন পৃথিবীকে আবাদ করা ও মানুষকে পরিচালনা করার জন্য, তাদের আত্মাকে পরিপূর্ণতা দানের জন্য ও তাদের মাঝে, তাঁর বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য, আল্লাহর প্রয়োজনে নয়। বরং সেখানকার বাসিন্দাদের দুর্বলতার কারণে তারা তাঁর (আল্লাহর) ফয়েয কবুল করতে অক্ষম, তাই মাধ্যমবিহীন তারা তাঁর নির্দেশ গ্রহণ করতে পারেনা।[৮১]

আল্লামা আব্দুল হাকিম শিয়ালকোটি বলেন, তার টীকাতে লিখেন, সৃষ্টির মাঝে কেন তা গ্রহণ করার ক্ষমতা নেই?

**لِمَا أَنَّهَ فى غاية الكُدُوْرَةِ والظلمة الجسمانية وذاته تعالى فى غاية التقدس والمناسبة شرط فى قبول الفيض على ما جرت به العادة الإلهية، فلا بد من متوسط ذا جهتى التجرُّد و التعلُّق ليستفيضَ من جهة و يفيض بأخرى .**

অর্থাৎ, নবীরা ছাড়া বাকী সকল সৃষ্টিজগতের মাঝে ময়লা ও শারিরীক অন্ধকার রয়েছে এবং আল্লাহর সত্তা সকল প্রকার পঙ্কিলতা ও অন্ধকার থেকে নিষ্কলুষ ও পুতঃপবিত্র। বরং পাপ-পঙ্কিলতা ও অন্ধকার আল্লাহর

[৮১]. বায়যাবী, ১/৬৮।

জাতে পাকের জন্য অসম্ভব। কোন ফয়েয কবুল করার জন্য ফয়েজ দাতা (আল্লাহ) ও গ্রহীতার (মানব) মাঝখানে সামঞ্জস্য থাকতে হয় যা সাধারণ নিয়ম। তাই মাঝখানে একটি মাধ্যম দরকার, যিনি সৃষ্টি ও প্রভুর সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে। যদিও সকল বিষয়ে আল্লাহ ক্বাদেরে মুত্বলাক। তাই আল্লাহ তায়ালা নিজ ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একটি মাধ্যম তথা খলিফা তৈরি করলেন। যিনি সকল পাপ-পঙ্কিলতা, শারীরিক অন্ধকার ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখবেন। আর এ সম্পর্কের মাধ্যমে জাতে বারী তা'আলা হতে ফায়দা (নেয়ামত) লাভ করে শারীরিক গঠনগত আকৃতি মানুষের ন্যায় হওয়ায় মানব জাতির সাথে সামঞ্জস্য রাখে, এ সামাঞ্জস্যের কারণে খলিফা (প্রতিনিধি নবী-রাসূল (আ) হতে সৃষ্টিজগত উপকার লাভ করে।

আল্লামা বায়যাবী (রহ) জীব বিজ্ঞানের একটি উপমা দিয়েছেন, যেমন হাড্ডি গোশত থেকে খাদ্য আহরণ করে, অথচ উভয়ের মাঝে কোন সামঞ্জস্য নেই, দুটি দুই সত্তার অধিকারী। একটি হল যাতে লফিত বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, যা অনুধাবন করা যায় না, অন্যটি হল ভারী দেহের অধিকারী। অর্থাৎ মহান আল্লাহ অভ্যাসগতভাবে নরম হাড্ডি সৃষ্টি করেছেন যা বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে রঙ্গে-ডঙ্গে হাড্ডি, তবে নরম হওয়ার কারণে গোশতের সাথে সম্পর্ক রাখে। তাই সেই নরম হাড্ডির মাধ্যমে শক্তিশালী হাড্ডি গোশত থেকে স্বীয় খাবার আহরণ করে। তাই এ নরম হাড্ডিতে দুটি দিক রয়েছে। একটি হল গোশত থেকে নরম হাড্ডি খাদ্য গ্রহণ করে আর নরম হাড্ডি থেকে শক্ত হাড্ডি খাদ্য গ্রহণ করে। শক্ত হাড্ডি ও গোশত এ দুয়ের মাঝে খাদ্য পৌঁছানোর মাধ্যম হিসাবে নরম হাড্ডিকে সৃষ্টি করেছেন। এ খোদায়ী নীতির উপর ভিত্তি করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাতে বারী তাআলা ও মাখলুকাতের মাঝে নে'আমত আদান প্রদানের মাধ্যম হলেন নবী-রাসূলগণ (আ)। যাঁদের মাঝে এ দুটি দিক রয়েছে।

এভাবে আল্লাহ গোশত থেকে হাড্ডি খাবর আহরণের ব্যবস্থা করেছেন। তেমনি আল্লাহ ও বান্দাহর মাঝখানে মাধ্যম হলেন নবীগণ। যারা দুদিকের অধিকারী তাদের মধ্যে নূরানিয়ত রয়েছে এবং মানুষের সাথেও সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ তারা এককভাবে নূরও নন এককভাবে বশরও নন উভয়য়ের সমন্বয়কারী এক প্রশংসিত গুণাবলীর নাম। যেরকম নরম হাড্ডি শুধু হাড্ডি নয় বরং সেখানে হাড্ডি রয়েছে এবং তা গোশতও নয় যা অত্যন্ত নরম বরং তা উভয়ের মাঝখানে তাই তা বেশী নরম না হওয়ার কারণে গোশতও বলা যায়না এবং বেশী শক্ত না হওয়ার কারণে তাকে হাড্ডিও বলা যায়না; বরং তাকে **غضروف** গাযরুফ বলা হয়। ঠিক তেমনি নবীগণকে শুধু মানবও বলা যাবেনা শুধু বশরও বলা যাবেনা বরং তাদের তৃতীয় নাম রয়েছে যাকে নবী ও রাসূল বলা হয়, তারা খোদা নন খোদার সমকক্ষও নন শুধু মানুষও নন। যদিও দেখতে মানুষের মত হন।

স্বর্ণ-রূপা পদার্থ মাটি থেকে সৃষ্ট, কিন্তু কোনো অজ্ঞ ব্যক্তিও স্বর্ণের দোকানকে মাটির দোকান বলবে না এবং স্বর্ণকে মাটি বলবে না। যদিও তা মাটি থেকে সৃষ্ট তবুও একে মাটি বলা যায় না।

নবীদের মাঝে বশরীয়ত কখনো বাস্তবে দেখা যায়, কখনো শক্তি হিসাবে দেখা যায়। বিদ্'আতী দলের প্রতি আমাদের চ্যালেঞ্জ 'আল্লামা বায়যাবী (রহ.)' যে কথার দিকে ইশারা করেছেন, সকলে মিলে এ উত্তর দিন, এটি ব্যতীত এর অন্য একটি নাম দিন।

বিদ্'আতী বা বাতিল ফেরক্বার মাযহাব হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাক্বিক্বত শুধুমাত্র বশর বা সাধারণ মানুষ, পার্থক্য শুধু অহী অবতীর্ণের। তখন পূর্বের প্রশ্ন ফিরে আসে, তখন আবশ্যক হয়ে যাবে যে, নবীগণও তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবেনা এবং ফয়েয হাসিল করতে পারবেনা। বাস্তবে মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল তিনি শুধু বশর ছিলেন। তাই

তারা বলত বশরের উপর কিভাবে অহী অবতীর্ণ হয়। অন্য কারো উপর কেন অবতীর্ণ হয়নি। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেন,

**اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ**

অর্থ মহান আল্লাহই ভাল জানেন, কাকে রাসূল বানাতে হয়। (সূরা আনআম: ১২৪)। এর উদ্দেশ্য হল নবীদের হাকিকত এমন যে, তাদের মাঝে রেসালতের সকল যোগ্যতা রয়েছে। মুশরিকগণ যাদের নাম তোমরা নিচ্ছ, তাদের মধ্যে সে যোগ্যতা নেই।

আমরা যদি রেসালতের ব্যাপারে বিদ'আতীদের মাযহাব মেনেও নি অর্থাৎ, নবীরা শুধু বশর তখন কাফিরদের প্রশ্নের উত্তর এ আয়াতের আলোকে কিভাবে দেওয়া যাবে?

আশ্চর্যের বিষয় হল দেওবন্দীদের গুরুদেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাছেম নানুতুবী উল্লেখিত আয়াতের সে ব্যাখ্যা করেছে, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। তিনি তো এ পর্যন্ত বলছেন জমিনের সেই অংশ যেখানে কাবা শরীফ আছে তার হাকীকত অন্যান্য জমিন থেকে ভিন্ন নতুবা কারণবিহীন প্রাধানত্য হবে।

উল্লেখিত আলোচনা তো সকল নবীদের ব্যাপারে। আর আমাদের নবী সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

**﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ﴾**

আল্লামা আব্দুল হাকিম শিয়ালকোটি, এ আয়াতের তাফসিরে বলেন,

**لأنّهَا تكاد تعلّم و لو لم يتّصل بملك الوحى و الإلهام الذى مثّل النار من أَنَّ العقول يشتعلّ عنها وفيه إشارة الى ما**

## سيجئ من أن قوله تعالى الله نور السموت و الأرض تمثيل للقوة العقلية فى مراتبها

অর্থাৎ, **الله نور السموت** এর মাঝে নবীদের বুদ্ধির বর্ণনা দেওয়া ও তাঁদের যোগ্যতার উপমা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের উপর ওহী ও ইলহাম যদি অবতীর্ণ নাও হয়, তখনও তাঁদের ফায়দা হাসিলের যোগ্যতা বিদ্যমান। তাই মুহাক্কিকিন আহলে সুন্নাতের আক্বীদা হল, যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাও নাযিল হত, তখনও তিনি সকল সৃষ্টির সেরা হতেন। তাঁকে যে রিসালতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা আলোর উপর আলো (নূরুন আলা নূর)।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾

"তিনি আলোর উপর আলো, সে নূরের দিকে যাকে চায় হিদায়ত করেন।" অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ যে হিদায়াতের মর্যাদা দিয়েছেন তোমরা তা বুঝনা, শুধু তা দ্বারা তাঁর নূরানিয়ত অর্জিত হয়েছে এমনটি নয় বরং সেই উঁচু মর্যাদার পূর্বেও তিনি নূর ছিলেন। তাই তাঁকে রেসালাত দান তা নূরের উপর নূর হয়েছে। সেই নূর কখনো বাস্তবে হয় কখনো শক্তিবলে হয়।

সেই নূর তো সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। সেই ধারণাকে দূর করার জন্য বলেছেন:

## يهدى لنوره من يشاء

তাঁর নূরের দিকে যাকে চায় হিদায়ত করেন অর্থাৎ সেই নুরুন আলা নূরকে বশরের (মানবীয়) চামড়া দিয়ে ঢাকা হয়েছে, সেই নূর পর্যন্ত নির্দিষ্ট পবিত্র আত্মার লোক পৌঁছবে, উচুঁমানের মেধাবী ও অতি পবিত্র আত্মাকে

সেই নূর পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা পৌঁছাবেন। বাকী কম মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি যারা, তারা বশরী পর্দায় পড়ে নিম্নমুখী হীনতর হয়ে যাবে।

এখানে আমি উলামায়ে মুহাক্কেকীনের বিশেষ করে আল্লামা মুহাম্মদ শাহ ও গোলাম রাসূল সায়ীদির বর্ণনা তুলে ধরেছি। এতটুকু পর্যন্ত তাওহিদ ও রেসালাতের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ও আহলে বিদাতের পার্থক্য বর্ণনা করেছি। সর্বপ্রথম নবীর সাথে ঘৃণা পোষণ তাঁর যুগেই উৎপত্তি হয়েছে যখন তিনি বলেছিলেন আমার নিকট সকল বস্তু পেশ করা হয়েছে।

আর আমি মু'মিন ও কাফির সকলকে চিনি। তখন মুনাফিকরা বলে, আমরা তো তাঁর সাথে আছি অথচ তিনি আমাদেরকে চিনেন না, যদি তিনি আমাদের সে কথা জানেন, তাহলে তার দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দিবেন না। যখন তাঁর নিকট মুনাফিকদের সেই কথা জানা হল, তখন তিনি সকল মানুষকে একত্রিত করলেন তখন তিনি বললেন:

## مَا بال أقوام طعنوا فى علمي فاسئلونى

কি হল কিছু জাতি আমার জ্ঞান সম্পর্কে মন্তব্য করছে? তাই তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। তিনি সে বক্তব্যে এত বেশী রাগ প্রকাশ করলেন হযরত ওমর (রা) হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহকে রব মেনেছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল মেনেছি এবং ইসলামকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছি, তাই আমাদেরকে ক্ষমা করুন।[৮২]

এরপর এ সকল মুনফিকদের সকল ফিতনা নিভে গেল, কখনো তারা মাথা উচুঁ করার সাহস পায়নি। এরপরে ৭৫০ হি. নাগাদ ইবনে তাইমিয়া এরকম বিভিন্ন ফিতনার জন্ম দিয়েছে। বিদ্আতী দলের এই নেতা হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে বলে, তিনি মালকে (সম্পদকে) মুহাব্বাত বেশী

[৮২]. বুখারী শরিফ।

করতেন এবং সে হযরত আলী (রা) সম্পর্কে বলে, "তিনি যেহেতু বাল্যকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাই তার ঈমান কবুল নয়।" [৮৩]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

**يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُولُهُ ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ ، (مشكوة ، بيهقى)**

অর্থাৎ, প্রত্যেক যুগে এমন কিছু সৎ আলিমের জন্ম হবে, যাঁরা বিদআতীদের সন্দেহ নিরসন করবে। বাতিলপন্থীদের মিথ্যা রচনা বা চুরি এবং অজ্ঞলোকদের ব্যাখ্যা বিশেষণের অবসান ঘটাবেন। সেই কারণে ইবনে তাইমিয়ার যুগের আলিমগণ থেকে আল্লামা যাইনুদ্দীন মালেকী তা রদ করেছেন। যার কারণে তাকে বন্দী করা হয়েছিল। অতঃপর যখন সে তাওবা করল তখন তাকে জেলখানা থেকে মুক্তি দেওয়া হল। কিন্তু সে আর নিজের অঙ্গীকার ভেঙ্গে ফেলল এবং এই ফিতনা সাময়িকভাবে মিটে গেল। তার ব্যাপারে ইবনে হাজার মক্কী নিজ ফতওয়ায়ে হাদিছিয়াতে লিখেন, **وأخذه اللهُ على علم** আল্লাহ তাকে তার জ্ঞান মতে পাকড়াও করেন। আল্লামা শামী বলেন: **ابتدع ابن تيمية** অর্থাৎ ইবনে তাইমিয়ার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও নতুন কিছু আবিস্কার করেছে।

অতঃপর তের শতাব্দীতে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদী শক্তির দাপটে সেই ফিতনাকে আবার চাঙ্গা করল, নজদ থেকে বের হয়ে হারামাইন শরীফকে দখল করল। আহলে সুন্নাতের আলিমদেরকে মুশরিক সাজিয়ে হত্যা করল তখন রুমের সুলতান বাহিনী পাঠিয়ে তা বন্ধ করল। এখন সেই ফিতনা আরব থেকে বের হয়ে হিন্দুস্তান ও সমগ্র দুনিয়া ঘিরে ফেলল। তাদের আলিমগণ সেই মিশন নিয়ে অনেক ফাদ আটকাল

[৮৩]. তাওযিহুল বয়ান: ১৭।

যেখানে কুফর ও শিরকের গোলা-বারুদ তৈরী হয় এবং তা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর নিক্ষেপিত হয় দুশমনির কারণে এবং তারা ওলিদের বেলায়েতকে অস্বীকার করে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে।

সমাপ্ত!